আরাকান ফ্রণ্টে

শান্তিলাল রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৩

বেংগল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ও মানসী প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

উৎসর্গ

আরাকানে বনে জঙ্গলে সুখে দুঃখে যাদের সঙ্গে জীবনের স্মরণীয় দিনগুলি কেটেছিল তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

"যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে ;
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে ,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।"

লেখকের কথা

বন্ধুবর নীহার গুপ্ত পরিচিতিতে যা লিখেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করে বলতে হচ্ছে এ বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবার কল্পনা আমার কোনদিনই ছিল না। এ ছিল আমার একান্ত নিজস্ব অতি আপনার জিনিষ। তিনিই একে লোকচক্ষুর সামনে টেনে বের করেছেন। আরাকান ভূগর্ভে নীহার গুপ্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং বন্ধুত্বের সূত্রপাত। বইখানির জন্মও হয়েছিল সেই ভূগর্ভের অন্ধকারে। সেই যোগাযোগের ফলেই ছাপার অক্ষরে হল তার প্রকাশ। স্নেহ এবং ভালবাসায় অন্ধ, তাই তিনি আমার ভাল দিকটাই শুধু দেখেছেন। তবে "যুদ্ধ সাহিত্যের দরবারে এই বইখানি যদি সত্যিকারের আসন লাভ" করে তবে তার কৃতিত্ব তাঁরই। দোষ ত্রুটি আমার। চিরাচরিত প্রথায় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর বন্ধুত্বের অপমান করতে চাই না। নীহার গুপ্তের বন্ধুত্ব যুদ্ধ জীবনের বরলাভ। এই বন্ধুত্বের শিখা চিরদিনের জন্য আমার মনের অন্ধকার কোণটুকু প্রদীপ্ত করে রাখবে।

এই বইখানি প্রকাশ করতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু যে কষ্ট এবং শ্রম স্বীকার করেছেন সেজন্য তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

লেখক।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শান্তিলাল রায়ের অনুরোধ : তাঁর লেখা বই 'আরাকান ফ্রণ্টে'র একটি পরিচিতি লিখে দিতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম কাজটা হয়ত এমন বিশেষ কিছুই কঠিন হবে না, কিন্তু আগাগোড়া বইখানা পড়তে গিয়ে দেখলাম, এই বইয়ের কোন প্রকার পরিচিতিরই প্রয়োজন ছিল না। পাঠক সমাজে এই পুস্তকের আসল স্থানটুকু আপনা হতেই খুঁজে পাবে এর নিজ গৌরবে।

আরাকান ফ্রণ্টে বইখানা আজগুবী মনগড়া যুদ্ধ এ্যাড্‌ভেনচার গল্প নয়। কলিকাতার পাকা দালানে বৈদ্যুতিক আলোর নীচে বসে, খান কতক যুদ্ধ সম্পর্কীয় পত্রিকা বা পুস্তিকা পড়ে আবোল তাবোল উদ্ভট আজগুবী ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা যুদ্ধ সাহিত্য নয়। এর প্রতিটি কথা সূর্যের আলোর মতই সত্য। একেবারে পুরোপুরি সত্য ঘটনা নিয়েই বইখানা লেখা হয়েছে।

১৯৪৩ সনের শেষের দিকে ও ১৯৪৪ সনের গোড়ার দিকে দুর্ধর্ষ জাপানী সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে সুদূর আরাকান প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনী যে কী শোচনীয় ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং কী ভয়ংকর হত্যালীলার এক প্রহসন সেখানে ঘটেছিল 'আরাকান ফ্রণ্টে' তারই জ্বলন্ত ইতিহাস।

আমাদের বাংলা দেশে সত্যিকারের যুদ্ধ সাহিত্যের একান্ত অভাব। এক কথায় সে রকম বই বাংলা সাহিত্যে একেবারে নেই বললেও চলে। যুদ্ধ সাহিত্য নাম দিয়ে যে কয়েকখানা বই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো শুধু অর্থহীনই নয়, যুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে সে গুলোর প্রচার বন্ধ করা উচিত। সেই সব লেখকদের লেখা পড়লে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্র

ত দূরের কথা, সত্যিকারের সৈনিক তাঁরা দেখেছেন কি না সে বিষ
সন্দেহ জাগে। বইগুলো অসংখ্য ভুলে ভরা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র!

বন্ধুবর শান্তি রায়কে যুদ্ধের ভয়ংকর জীবনের সঙ্গে পরিচিত
হয়েছিল। নিজে তিনি আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, যু
সৈনিকদের সঙ্গে পাশাপাশি দীর্ঘকাল। তাঁর সেই ভয়ংকর অভি
হতেই এই বইখানি লেখা হয়েছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁরা জানতে চান, তাঁরা এই বইখানা পড়লে শুধু
যুদ্ধজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন তা নয়, অনেক জ্ঞান লাভও করে
সত্যিকারের সৈনিক জীবন যে কী, তা তাঁরা উপলব্ধি ক
পারবেন। জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সৈনিকদের প্রতিটি মুহূর্ত যে
ভাবে অতিবাহিত হয় সেই জীবন্ত আলেখ্য এই বইখানির
পাতায় পাতায়।

শান্তি রায় সাহিত্য জগতে নবাগত। কিন্তু লেখনী তাঁর শক্তিশ
ভাষার পরে তাঁর অসাধারণ দখল। সত্যিকারের একজন কথা
তিনি। এক সময় আরাকানের যুদ্ধক্ষেত্রে ওঁর সঙ্গে আমাকে পাশা
থাকতে হয়েছিল অনেক দিন, সেই সময়ই ওঁর সঙ্গে আমার প
আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে বসে উনি যখন গোলাগুলির মধ্যে ব
লিখছিলেন তখনই ওঁকে আমি বলেছিলাম বইখানা প্রকাশ ক
যুদ্ধ সাহিত্যের দরবারে বইখানি যে সত্যিকারের স্থান লাভ করবে
বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

২৭শে পৌষ ১৩৫২,
১১২ সাউথ সিঁথি রোড
ঘুঘুডাঙ্গা।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আরাকান ফ্রন্টে

এক

"কালের যাত্রাপথে জীবনের রথ,
নিত্য সে উধাও"

১৯৪২ সালের সুরুতে মালয় থেকে গৌরবময় পশ্চাদপসরণের পালা কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ করে হৃতসর্ব্বস্ব অবস্থায় জন্মভূমি ভারতভূমিতে ফিরে এলাম। যুদ্ধ জীবনের চাকরীতে যোগ দিয়েছিলাম ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি, যখন বলদৃপ্ত জার্ম্মানী দুর্ব্বার বিক্রমে দেশের 'পর দেশ পদানত করে পৃথিবীময় এক মহাপ্রলয়ের ঝড় তুলে চলেছে; মহাবীর নেপোলিয়নের ফ্রান্স তখন জার্ম্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণে স্তম্ভিত, মূহ্যমান। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে জার্ম্মানীর মত ও পথ অনুসরণ করে সুদূর প্রাচ্যে জাপান অবলীলাক্রমে দেশের পর দেশ জয় করে এতদিনকার স্থাপিত ব্রিটিশ গৌরব, সম্মান, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি এক নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিল। অপরাজেয় ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ ইতিহাসে সেই সর্ব্বপ্রথম গৌরবহীন শোচনীয় পরাজয়ের কলঙ্কময় অধ্যায় সৃষ্টি হল। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস থেকে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের

নানা জায়গায় সামরিক হাসপাতালে কার্য্যে রত ছিলাম, সবই ছিল শান্তিপূর্ণ জায়গা —(Peace Station)। ম দেশ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ধ লীলার শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর মনে প্রাণে শান্ত নির্ব্বি জীবন চেয়েছিলাম সত্য। কিন্তু চা'র ছ'মাস যেতে না যে বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমির ভারে মনপ্রাণ ভারা হয়ে উঠল। নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়তা এবং মন্থরতার আব আমার চারিদিকে স্তূপীকৃত হতে লাগল। দেহ এবং সক্রিয় সঙ্কল্প শক্তি যেন সেই আবর্জ্জনার চাপে অবরুদ্ধ উঠতে লাগল। স্থির করলাম মনের এই ব্যাধিকে অস্বী করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের এ্যাড্‌ভেঞ্চার পূর্ণ জীবন বরণ নিয়ে এই স্থবিরত্ব ভার মন্থর জীবন ধারার মূলে আঘাত ক হবে। মন প্রাণ দিয়ে বলতে হবে, গাইতে হবে, 'আমি হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" অনেক বাধা বিপত্তি অতি করে বড় কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করে বদলীর প্রার্থনা জানাল ভীরু অসামরিক বাঙ্গালী আমি যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে (F Line) যেতে চাই শুনে অবাক হয়ে আমার দিকে কি তাকিয়ে থেকে বললেন—"অল্ রাইট্...গুড্ লাক্"—প্র মঞ্জুর হল। মূষল পর্ব্বের সূচনা সুরু হল, ১৯৪৩ স শেষাশেষি।

জানুয়ারী, ১৯৩৪, নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অধ্যায় সুরু হল নতুন অভিযানের পালা নিয়ে। সব জিনি

আরম্ভ হয় শুভ মঙ্গল কামনা দিয়ে। আমার এ যাত্রা সুরু হয়নি। গুরুজনদের কল্যাণ আশীর্ব্বাদ নিয়ে, মঙ্গল ঘট সম্মুখে রেখে, মঙ্গল চণ্ডীর রক্ষাকবচ সঙ্গে রেখে। বিদায় ক্ষণে অশ্রু-কাতর আঁখি মনকে ব্যথাতুর করে তোলে নাই ; "সজল করুণা মাখা মিনতি বেদনা আঁকা" নত নেত্রদ্বয় নীরবে আমার দিকে চেয়ে থাকেনি অথচ সাধারণ সহজ সুরে, "আসি ভাই! বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে" শুধু এই কথা কয়টি বলে প্রিয় বন্ধুজনকে ছেড়ে দূরে যাওয়ার ক্ষণটুকু স্বতঃই মনটাকে উদাস করে দিল। মনের গোপন পুরে অকারণ ব্যথা জাগাল এবং গাড়ী ছেড়ে দেবার পরও বেশ কিছুক্ষণের জন্য সেই বেদনার রেশ রেখে গেল।

কিন্তু দুরন্ত অবাধ নির্ভীক যৌবন তখন প্রাণ প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। অপূর্ব্ব নব নব বৈচিত্র্যের নতুন অনুভূতির মোহ তখন আমার সমস্ত কল্পনা দিয়ে মনের মধ্যে এক স্বপ্নময় নীড় রচনা করেছে। জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদন আরাম লালিত গৃহ কোণে নয়, সংসারে জীবনধারা চলে গড্ডালিকা প্রবাহে। ঘোলা জলে ক্ষুদ্র খানা, ডোবায় ভীরু ভেকের মত সঙ্কীর্ণ সে জীবন। এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নায়কের মত রোমাণ্টিক জীবন যাত্রার ভেতর যে নব নব বিচিত্র অনুভূতি, প্রতি মুহূর্ত্তে দুঃখ ও বিপদের সংঘাতে বেঁচে থাকার যে নিবিড় আনন্দ উপভোগ, তারই উল্লাস ও অনুপ্রেরণার শিহরণে মনপ্রাণ তখন আমার উদ্বুদ্ধ। আশা, উৎসাহ, সাহসে সমস্ত অন্তরটা ভরে উঠল—

অভিনব রসাস্বাদের আকাঙ্ক্ষায়—পূর্ণগতির বেগে নব নব দেশে নতুন করে চলার পথে।

আমি বিশ্বাস করি গতিই জীবনের ধর্ম্ম। প্রতিনিয়ত চলমান পৃথিবীর যাত্রার মধ্যেই মানুষ জেনে এবং না জেনে স্বীকার করেছে অসীমকে। এই যাত্রার মধ্যেই সে চেয়েছে সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি। সেই চলার বিরাম মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ আমরা অহরহ তাই মৃত্যুর স্পর্শ পাই। জীবনের আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো হয়ে সব ঠাঁই। চলতে চাই, দেখতে চাই, বুঝতে চাই। সুখ দুঃখ কোনটাই নিছক সত্য নয়। শান্ত গৃহকোণেও বেদনা পাই আমরা, ব্যর্থতা আসে বহুবার, দুঃখ পাই বহুরূপে। জীবন যাত্রার উপলব্ধি সত্যিকার আনন্দ অনুভূতির ভেতর। সেই পরমানন্দ প্রাপ্তির পথে বহুবার দুঃখানলে পুড়তে হবে। তার জন্য মনের ধর্ম্ম যেন না হারাই। চলার পথেই সে ধর্ম্মের সার্থকতা, সন্ধানের পথেই সেই আনন্দ। জীবনের রথ তাই এবার সুরু করল তার যাত্রা, চলার পথে নতুন করে তার সারথিকে নমস্কার জানিয়ে—

“জীবন পথের হে সারথি
আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহ নমস্কার”

কলকাতা ছেড়ে ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে পৌঁছুলাম শিলচর বিষণপুর পথের মধ্যবর্ত্তী স্থলে। নতুন জায়গায় আবার

নতুন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘর বাঁধা সুরু হয়। যাদের জীবনে কোনদিন দেখিনি, তারাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়, প্রিয়জন হয়ে ওঠে। এই যে চিরবিচ্ছেদ ও চিরমিলন এই দুই পর্ব্বই জীবনভর নিরন্তর অভিনয় করতে হয় বারবার। তবুও নিত্য নতুনের মাপে চিরপুরাতনকে খুঁজে পাবার চেষ্টার বিরাম নেই। এখানে ভাল করে ডেরাডাণ্ডা বাঁধবার আগেই বিদায়ের নোটিশ পেলাম। মন বলে উঠল হেথা নয় তোর ঠিকানা।

—"যেতে হবে অনেক দূরে
চলতে হবে একলা তোরে
নাইকো সাথী নাইকো আপন জন
সাক্ষী শুধু আপন মন।"

সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধা শেষ হল। শুধু আমাদের মোটর গাড়ীগুলি বইবার জন্য মালগাড়ীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হল। জরুরী তাগিদ আসায় স্থির হল আমি অগ্রগামীদল (Advance party) নিয়ে রওনা হব। কুমিল্লা পৌঁছে সেখান থেকে মালগাড়ী ফেরৎ পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। কুমিল্লা তখন চতুর্দ্দশ বাহিনীর প্রধান আড্ডাস্থল (Head quarters of 14th army)। কুমিল্লায় সকলে একত্রিত হয়ে মোটরে করে আমরা আরাকানের পথে রওনা হব, মাটির তৈরী নতুন রাস্তা ধরে।

সেদিন রাত্রেই রওনা হলাম। সে এক অভিনব যাত্রা, মোটর গাড়ীতে আরূঢ় অবস্থায় বসে আছি অথচ মোটর গাড়ী

চলেছে ছাদ বিহীন মালগাড়ীর সওয়ার হয়ে সার্কাসের জানোয়ারদের মত বাক্সবন্দী হয়ে। অবশ্য মালগাড়ীর ভিতর চারপাশে যৎ সামান্য চলাফেরার জায়গা অবশিষ্ট ছিল। যাত্রীগাড়ীর সঙ্গে আমাদের মোটরবাহী মালগাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য সব যাত্রীর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি অথচ চলেছি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। আমরা যেন অন্য জগতের জীব, সকলের সঙ্গে পৃথক থাকা ও চলা ভিন্ন উপায় নেই। সঙ্গে যৎসামান্য আহার্য্য। পুরু শুকনো বিস্কুট, টিনের মাছ এবং মাংস, স্নানের নাম গন্ধ নাই। খোলা গাড়ীর ভেতর ধূলি, উৎসব করে বেশ আন্তরিকভাবে মিতালি পাতাচ্ছে। ধূলি ধূসরিত রুক্ষ মূর্ত্তিতে একদিন একরাত্রির পর যাত্রা স্থগিত রইল কুমিল্লা ষ্টেশনে পৌছে। নিজেদের মোটর গাড়ীগুলো নামিয়ে, তাঁতে চেপে ময়নামতী পৌঁছলাম।

নতুন জায়গায় আবার নতুন বন্ধুবান্ধব তৈরী হল। অল্প সময়ের মধ্যেই মনে হল এরা আমার অতি আপনার জন। কিন্তু অন্তরের বিশেষ টান হলনা কারণ অগ্রগতির দূত অহরহ তাগাদা দিচ্ছে “আগে, আরো আগে” তিন চারদিনের মেয়াদ মাত্র, সবাই জানি তারপর ছাড়াছাড়ি হবে। তবুও অনেকদিন পর দুচারজন বাঙ্গালী বন্ধু পেয়ে, বাঙ্গালায় কথা বলে মন অনেকটা হাল্কা বোধ হতে লাগল। যুদ্ধ জীবনের চাকরীর তখন আমার পাঁচ বৎসর চলেছে। এর মধ্যে বাঙ্গালীর সংস্পর্শে এসেছি খুবই কম। বহুদিন পর বাঙ্গালী বন্ধু পেলাম

কিন্তু এদের সঙ্গে শুধু পরিচয়ই হল। হলনা ভাবের আদান প্রদান। বাকী রয়ে গেল পরস্পরের মন জানাজানি। অবশিষ্ট দল এসে পৌঁছতেই চলা স্থুরু হোল মোটর গাড়ীতে। গন্তব্য স্থান···বর্ম্মার আরাকান প্রদেশ।

আগের দিন সন্ধ্যা বেলায় সব জিনিষপত্র বাঁধা এবং গাড়ীতে রাখা শেষ হল। অতি প্রত্যূষে পরিচিত কাউকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে আকাশ পথে শুধু ভোরের শুকতারাটির দিকে একবার চেয়ে চলার পথে পা বাড়িয়ে দিলাম। এ পথের আর শেষ নেই। পাহাড় কেটে তৈরী মাটির রাস্তা। পাথরের কোন চিহ্ন নেই। শুধু মাটি ও বালির স্তূপীকৃত পর্ব্বতমালা আর নানা রঙের ধূলা। এঁকে বেঁকে সর্পিল ভঙ্গীতে পাহাড়ী রাস্তা চলেছে। কখনো উপরে উঠছি, কখনো নীচে নামছি। ধূলির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মোটর গাড়ীগুলির সামনে ধূলার ঘনীভূত জাল তৈরী হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। সম্মুখে চার, পাঁচ হাতের বেশী কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়না। রাস্তার দুইধারে পাহাড়ের কোলে, বুকে এবং মাথায় দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছি তো চলেছিই।

সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত দেহে পাহাড়ের বুকে, গাছের কোলে তাঁবু খাটিয়ে আশ্রয় নিই। পেট্রোল ষ্টোভে পালা করে টিনের খাদ্য রান্না করে খাই। সেই ছেলেবেলার চড়ুই ভাতির মত নিজের হাতে রান্না—স্বাদ তার সব সময়ই অমৃত। মোটর গাড়ীগুলি পরিষ্কার করে রাত্রের মত বিশ্রাম। অতি প্রত্যূষেই

আবার তাঁবু গুটিয়ে চলা সুরু হয়। এই হল আমাদের দৈনন্দিন চলার রীতি। এই ভাবে ফেণী, চট্টগ্রাম, দোহাজারী, কক্সবাজার অতিক্রম করে, নদী নালা ডিঙ্গিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে রামু, রাম কেপালন, উখিয়া, তম্ব্রু ঘাট, বউলি বাজার এবং আরো অনেক অখ্যাত জায়গা ছেড়ে গিয়ে অবশেষে সপ্তাহ শেষে বর্ম্মা আরাকান সীমান্ত পার হয়ে সত্যিকার আরাকান মুলুকে পৌছলাম।

জায়গাটির নাম "ছোট মংডানা" (Chota Mangdana)। পাশেই অধুনাখ্যাত "মায়ূ" পর্ব্বতমালা (Mayu Range)। সানুদেশ বেয়ে একটি ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য নদী। কোথাও আবক্ষ কোথাও হাঁটু সমান গভীরতা। আবার কোথাও সামান্য জল তর্ তর্ করে গড়িয়ে চলেছে। সপ্তাহ শেষে এই জলে স্নান করে দেহ মন আনন্দে ভরে উঠল। সব ক্লান্তি, মলিনতা দূর হয়ে গেল। এখানে এসে আমাদের মতন আরো অনেক পথচারী দলের সঙ্গে মিলন হল। মায়ূ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত উপত্যকায় তাঁবু খাটিয়ে কাজের পালা সুরু হল। পূরা হাসপাতালটাই তাঁবুর ভেতর, আড়াইশ থেকে পাঁচশ রুগী থাকবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের পল্টনটা ছোট "ভ্রাম্যমান অস্ত্র চিকিৎসা ইউনিট" (Mobile Surgical Unit)। অফিসার সংখ্যা তিনজন। একজন শল্যশাস্ত্র বিশারদ সহকারী বিশারদ এবং এনেস্থেটিষ্ট (Anaesthetist) এই তিনজনের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয় ডাক্তার।

সব রকম সাজ সরঞ্জামই সঙ্গে মজুত ছিল। ব্যাটারী যোগে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত। স্বল্প মেয়াদী নোটিশে দ্রুত চলাফেরার জন্য চার খানা মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য সহকারী সংখ্যা পনের জন। আমাদের কাজ ছিল ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের (Field Ambulance) সঙ্গে সংযুক্ত থেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সদ্য আনীত আহতদের উপর অস্ত্রোপচার করা এবং অল্প সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা। এই রকম তু' চারটি ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যান্য হাসপাতাল (Casualty clearing station) সেখানে এনে জড় করা হয়েছে। যুদ্ধের গতি বুঝে, প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাদের আবার নতুন জায়গায় পাঠান হবে। আমরা এবং অন্য তুইটি ফিল্ড হাসপাতাল কাজ আরম্ভ করে দিলাম। তাঁবু খাটিয়ে হাসপাতাল তৈরী এবং গোছানর পর সুরু হল যার যার নিজস্ব বাসস্থান তৈরী করবার পালা। প্রত্যেকের বরাদ্দে ক্ষুদ্র একটি তাঁবু। কোন রকমে মাথা নুইয়ে ঢোকা চলে এবং সটান লম্বা হয়ে অন্য প্রান্তে না ঠেকিয়ে শোয়া চলে। পাহাড়ের কোণ ঘেসে, বনের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে, শুষ্ক নালার বুকে সে সব তাঁবু খাটান হল। পাহাড়ের বুক বেয়ে চলেছে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী। চারিদিকে তুর্ভেদ্য জঙ্গল। এই গভীর চলচ্ছায়ার অন্তরালে গর্ত্ত খুঁড়ে পায়খানা তৈরী হোল। স্নানের জায়গাও অনুরূপ। বিভিন্ন রকমের খালি টিন জোগাড় করে স্নানের টবে পরিণত করা

হোল। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সমান্তরাল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ সীমাহীন পর্ব্বতমালা এবং পার্ব্বত্য নদী ও নালা। পাহাড় আর নদী, নদী আর পাহাড়। একটি ছোট পাহাড়ের পার্শ্বদেশ সমতল করে 'তাঁবুর নীচে তৈরী হোল "অফিসারস্ মেস" (Officers Mess)। এই হোল আমাদের আহার, বাসস্থান এবং কর্ম্মস্থল।

আমাদের অবস্থিতি এখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে পাঁচ মাইল দূরে, "মংডোর" (mangdaw) কিছু আগে। চারিদিকে সশস্ত্র পাহারা, উপরে চারিদিকে পাহাড়ের শিখর ছেয়ে গোপনে সজ্জিত বিমান বিধ্বংসী কামান সমূহ, নীচে বিভিন্ন আকৃতির কামান, ট্যাঙ্ক বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ী, ব্রেণ্ গান, মেশিনগান মর্টার এবং নানাবিধ বিভিন্ন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্রের সমাবেশ। চারিদিকে পরিখা (trench) খুঁড়ে তারকাঁটার (barbed wire) বেড়া দিয়ে রক্ষী সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত। গোধূলির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ে। বাইরে বাতি জ্বালার হুকুম নেই। এমন কি সিগারেট ধরান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। নিশাচর শত্রুদের হাত থেকে আত্মগোপন রাখবার এ একটা পদ্ধতি।

রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে গর্জ্জে ওঠে কামানের আওয়াজ। বিমান বহর চলার শব্দ, বিমান ধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষণ, ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণ-হুঙ্কার, রাইফেল ও মেশিনগানের শব্দ নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে

বন্য পশুর ভয়ার্ত্ত কলরব, অতিকায় গিরগিটির আর্ত্তনাদ—এই সব কিছুরই প্রতিধ্বনি গিরি গুহার কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়ে সৃষ্টি হয় এক মহা প্রলয় গর্জ্জন। নিশ্চল নিশীথিনী ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে। আমরা সবাই সন্ত্রস্ত, সশঙ্কিত অবস্থায় দিনের আলোর আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করি।

অদূরে লড়াই চলছে, সমস্ত দিন ধরে আহতদের আর্ত্তনাদ, আর এই মারণ যজ্ঞের হোতাদের অস্ত্রোপচার চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা দিয়ে কাটে আমাদের সমস্ত দিন। প্রত্যহই দুচার বার শত্রু বিমান আমাদের মাথার উপর দিয়ে ঘোরা ফেরা করে যায়, জানতে চায় কারা এই দুঃসাহসী নব আগন্তুক দল। সাইরেন অভাবে একমাত্র বিমান ধ্বংসী কামানের গোলার আওয়াজে শত্রু বিমানের আগমন সংবাদ পেতাম, পরে অবশ্য এসব গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিরাট রেডক্রশ পতাকাতলে সেবাধর্ম্মিদের তারা অনুকম্পাই করে এসেছে, ক্ষতি করবার চেষ্টা করেনি। পরে অবশ্য তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে এ ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখানে থাকাকালীন অবস্থায় কোমরে বদ্ধ রিভলবার অপেক্ষা হাতে আঁটা রেডক্রশ চিহ্ন যে অধিকতর নিরাপদ বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি।

দুই

তখনো কেমন করে ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসছে কালো ছায়া ফেলে ধীরে ধীরে জানতে পারিনি। তবে লক্ষ্য করলাম সকলেরই মুখ যেন গম্ভীর, কেমন বিষন্ন। অপরাহ্নে জানতে পারলাম, জাপানীরা দু'তিন দিন আগে জ্ঞাতব্য খবরাখবর, বিশেষ করে আমাদের সৈন্যসমাবেশ সংখ্যা ও পদ্ধতি জানবার জন্য দুই মাইল পেছনে আমাদের সীমানার উপর হানা দিয়ে অনেক কিছু ক্ষতি করে গিয়েছে। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে পাশ কাটিয়ে নালার বুক দিয়ে আমাদের পেছনে এসে পড়েছে। অনেক পরে অবশ্য জানতে পারি জাপানীদের আরাকান যুদ্ধের ত্রিমুখী আক্রমণের (three pronged drive) এক মুখ আটকে আমরা বাসা বেঁধেছিলাম। সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হল, আজ রাত্রে শত্রু সৈন্য দ্বারা আক্রমণ আশঙ্কা সম্বন্ধে, ভেতরের ব্যাপার কিছুই ভাঙ্গা হলনা। সবাইকে কার্তুজ এবং গুলি দেওয়া হল। যুদ্ধরত সৈন্য ছাড়া আরো অনেক নতুন রক্ষী আমদানী হল। রক্ষী সৈন্যদল পাহাড়ের কোল ঘেষে নালার বুকে ব্যূহ রক্ষার্থে যে যার জায়গা নিল। চারিদিকে নিঝুম ভয়াবহ নিস্তব্ধতা আসন্ন ঝড়ের আগে স্তব্ধ থমথমে ভাব।

যুদ্ধরত সৈন্যদের তো কথাই নাই রক্ষী সৈন্যদের উপর হুকুম জারী হল শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সন্ধ্যার পর চলন্ত অবস্থায় যে কোন মানুষকে দেখতে পেলেই গুলি চালাবে, সন্দেহজনক শব্দের আভাষ পেলেই শব্দ লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করবে।

ঘন অন্ধকার রাত্রি, কোলের মানুষ চেনা যায়না। হাত দিয়ে যেন অন্ধকারকে অনুভব করা যায় এমনি নিরেট। ফ্রণ্ট লাইন থেকে কয়েক জন আহত সৈন্য এসেছে, আমরা অস্ত্রোপচার করছি তাঁবুর ভেতর গর্ত্ত তৈরী করে। অস্ত্রোপচার গৃহে একটি সৈন্য হাত বোমার (grenade) আঘাতে জখম হয়েছে, পেটের ভেতর ছোট অন্ত্র (small Intestine) অনেকটা ঝাঁঝরার মত ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে আবার কোণাকুণি জুড়ে দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে ব্যাটারী ও বিজলীবাতি ছাড়া বিশেষ ভাবে তৈরী হাতবাতি (torch) ছিল। হাত বাতির দেহাংশ পিঠের ওপর জামার গায়ে হুক দিয়ে আটকান হয়, আর অগ্রভাগ শিরস্ত্রাণের মত কপালের উপর থাকে মাথার চারিদিকে চওড়া ফিতা এঁটে। একে অবশ্য প্রয়োজন মত উঁচু নীচু করা চলে। তারই সাহায্যে অন্ধকারে কাজ হচ্ছিল।

হঠাৎ রাত্রির নিস্তদ্ধতা ভেদ করে গর্জ্জে উঠল এক রাইফেলের আওয়াজ। গুলি অস্ত্রোপচার গৃহের শীর্ষদেশ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। সঙ্কেত ছিল গুলি ছোঁড়ার প্রথম শব্দ হলেই আর

সবাই যার যার লক্ষ্য রেখে সামনের দিকে গুলি চালাবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা হল জাপানীরা আমাদের সীমানা আক্রমণ করেছে। গায়ের সাদা আলখাল্লা (operating gown) টান দিয়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ট্রেঞ্চের বুকে। ভূগর্ভে অপরিসর স্থান তখন প্রায় ভরে উঠেছে মানুষের ভীড়ে তারই মধ্যে কুকুর কুণ্ডলীর মত জড় সড় হয়ে পড়ে রইলাম। মাথা তুলতে সাহস হচ্ছেনা, লোহার টুপি সঙ্গে আনিনি। অনবরত অনল বর্ষণ আর প্রলয় গর্জ্জন চলেছে বিরামহীন, বিশ্রামহীন। কক্ষচ্যুত তারকার মত অগণিত উত্তপ্ত শেল মাথার উপর দিয়ে উল্কাবেগে আকাশ পথে ছুটে চলেছে, শব্দে কান বধির হবার জোগাড়। অসংখ্য মেশিনগান, ব্রেন ও স্টেনগান, রাইফেল এবং রিভলভার থেকে গুলি বর্ষণ চলছে, এই সব বিবিধ আকারের ভয়াবহ শব্দের মিশ্র গর্জ্জন আকাশে বাতাসে কাঁপন আর পৃথিবীর বুকে তুলে দিল নাচন। ট্রেঞ্চের গায়ের মাটি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল আমাদের গায়ে ট্রেঞ্চের বুকে, মাটির গর্ত্তে এক গেঞ্জী গায়ে জানুয়ারী মাসের কনকনে শীতে জড়সড় অবস্থায় আর থাকা চলেনা। কারো হাঁটুতে হাঁটু লাগছে, ভয়ের কাঁপুনিতে কারো মুখ উৎকণ্ঠায় আতঙ্কে শুকিয়ে আমচুর। ভাষা নাহি সরে মুখে" আবার দু'চার জন বেসামাল হয়ে কাপড়ে চোপড়েই…। কেউবা মূর্চ্ছাগত, সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে জীবনের উপর এই মায়া। মরণের এই ভীতি সত্যই আশ্চর্য্য।

এই ভাবে দু'ঘণ্টার উপর অতিবাহিত করলাম। অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই, ধৈর্য্যের সীমা শেষ হয়ে এসেছে। পরিস্থিতি ক্রমে গুরুতর মনে হতে লাগল। শীতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ঠিক করলাম অদৃষ্টে যা থাকে নিজের আশ্রয়স্থল তাঁবুতে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকব। এই ট্রেঞ্চ থেকে আমার তাঁবু প্রায় দুশ গজ। গুড়ি গুড়ি মেরে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে নালার বুক বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। মাথার উপর গোলাগুলির শব্দ পেলেই নালার গর্ত্তে সটান শুয়ে পড়ি, আবার গুড়িগুড়ি মেরে এগোই। এই ভাবে নিজের তাঁবুর ভেতরে ঢুকলাম। এইবার লোহার টুপী মাথায় এঁটে এক ছোট কাঠের প্যাকিং বাক্সের খোলের মধ্যে মাথা ঢাকলাম। সমস্ত বিছানা পত্র একত্র করে শরীরটাকে মুড়ে জেলে পুটুলীর মত পড়ে রইলাম।

শব্দ লক্ষ্য করে বুঝলাম আমার তাঁবুর ঠিক পশ্চাদ্ভাগে একটি টিলার উপর থেকে ব্রেণ গাণের গুলি চলছে আমার তাঁবুর উপর দিয়ে। এটি আমাদের একটি গান্ পোষ্ট (gun post)। থেকে থেকে বড় কামানগুলো গর্জ্জে উঠছে, আর তার অনলশিখা বিজলী ঝলকের মত অন্ধকার আকাশের বুক চিরে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চমকিত করে তুলতে লাগল। আমার তখন বিশেষ কোন অনুভূতি ছিলনা। এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম নয়, অনেকটা

অনাসক্ত নির্লিপ্ত ভাব, তবুও উৎকণ্ঠায় ভরা প্রাণ। কতক্ষণ আর পড়ে থাকা যায়, বেশীক্ষণ থাকতেও হলনা। হঠাৎ এক ব্রেনগান বার্স্ট (burst) তাঁবুটিকে আমার ভূমিস্যাৎ করে দিল।

প্রায় পঁচিশ গজ দূরে এক গুহার ভিতরে ছিল ক্যাপ্টেন টোটের আবাস। সেখানে আশ্রয় নেব ভেবে নালার বুক ঘেঁসে এগিয়ে চললাম চুপচাপ। পিছনে তাকিয়ে দেখি আমার তাঁবু তখন অনল শিখায় ভস্মসাৎ হচ্ছে। টোটের আড্ডার পাশে যেতে না যেতেই শুকনো পাতার উপর পায়ের শব্দে টোটে শত্রুর পদধ্বনি ভেবে শব্দ লক্ষ্য করে রিভলভার ছুঁড়ল। অনভ্যস্ত হাত, তাতে ভয়ের কাঁপুনি লক্ষ্যভ্রষ্ট নিশ্চিত। টোটে যুদ্ধক্ষেত্রে নবাগত এবং এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। গুহার পেছন দিক থেকে উঠে একটা পাথরের ঢিবির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে টোটেকে পরিচয় দিলাম। সে দেখি আবার রিভলভার বাগিয়ে ধরেছে গুলি করবার উদ্দেশ্যে। অতিকষ্টে বোঝালাম আমি রায়। তখন তার চমক ভাঙল, কম্পিত হস্ত থেকে রিভলভার খসে পড়ল, আমিও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম।

মৃত্যুর জন্য বিশেষ ভয় ছিলনা। ভয় শুধু আহত বিকলাঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকবার। এদিকে দুজনেরই পিপাসা পেয়েছে সাংঘাতিক, অথচ পানীয় জল বোতলে নেই। উৎকণ্ঠা, শ্রান্তি ও পিপাসা দূর করবার জন্য দু'জনেই দু'চার

ডোজ রাম (rnm) খেয়ে চাঙ্গা হলাম। একটু পরেই টোটের চাপা কণ্ঠের গান সুরু হল

"অব তেরে সেবা কোন মেরা কৃষ্ণ কানাইয়া
ভগবান, কিনারেসে লাগা দে মেরি নাইয়া"

বুঝলাম ঔষধ ধরেছে। এ রামেরই মহিমা, দুজনে অবশিষ্ট বোতল শেষ করে ভয় ও উৎকণ্ঠাকে নির্ব্বাসন দিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার ঠিক নেই।

তিন

কাল রাত্রি প্রভাত হল। রাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার বোঝার ভারে সবাই আতঙ্কিত। এক রাত্রের মধ্যে সে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। তখনো মাঝে মাঝে কামানের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, পরক্ষণেই আকাশের গায়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ঈষৎ স্ফুরণ শেষ চিতারশ্মির মতন। হুকুম হোল সব জিনিষপত্র বেঁধে আজই পিছনে সরে পড়তে হবে। সেই দিন থেকে জাপানী বিমান বহর চারিদিকে একাগ্রীভূত আক্রমণ বোমা ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণ সুরু করল। তারপর সে হয়ে দাঁড়াল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন দিন যায় নাই যেদিন শত্রুর বিমান বহর চার পাঁচবার আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাতায়াত করেনি বা আমাদের বিমান ধ্বংসী কামানসমূহ গুরু গম্ভীর আওয়াজে অনল বর্ষণ করেনি।

অথচ সকলের আশ্রয় নেবার মত ট্রেঞ্চ ছিলনা বললেই চলে। পাহাড়ে, ঝোপে, জঙ্গলে, নালার বুকে আশ্রয় নিতে হত। তাদের লক্ষ্যের মধ্যে অবস্থিত রেডক্রশ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান সমূহের তখন পর্য্যন্ত তারা কোন ক্ষতি করে নাই যদিও তাদের পক্ষে সেটা একান্ত সহজসাধ্য ছিল।

ভোর বেলা অস্ত্রোপচার ঘরে ঢুকতেই দেখি আগের দিন রাত্রের পেটকাটা যে আহত রুগীটিকে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, অপারেশন টেবিল উল্টে তার প্রাণহীন দেহ তারই নীচে পড়ে রয়েছে। তাকে কবর দেওয়া হল। কিন্তু বহুকাল ধরে নিশীথ শয়নে, স্বপনে তার সেই পেট চেরা ভয়াবহ মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ভেসে বেড়াত, মনের দরজায় হানা দিত। গ্লানিতে মনটা ভরে উঠত। কিন্তু* কিইবা করতে পারতাম। অন্ধকারে অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখতেই হত, দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর তার মৃত্যু দেখা ছাড়া আর কোনই গত্যন্তর সে রাত্রে ছিলনা।

হুকুম মত জিনিষপত্র বেঁধে মোটর লরীতে চাপিয়ে তৈরী হয়েছি যাবার জন্য। সারিবন্দী হয়ে সব অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছি রাস্তার উপর। বেলা দশটার সময় হুকুমের মত খবর এল বহু আহত সৈন্যদের অস্ত্রোপচার করা অত্যন্ত জরুরী। "যুদ্ধের অবস্থা আয়ত্তাধীন" (Situation under control)। "সার্জ্জিকাল ইউনিট" অর্থাৎ আমাদের কাজ করতেই হবে। আবার লোকজনদের

হুকুম দিয়ে অপারেশন তাঁবু খাটান হল। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বের করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার তৈরী হতে হল। দিনের পর দিন বহুবার এই অবস্থার ভেতর কাজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে কারো ক্লান্তি, বিরক্তি, গ্লানি সাধ অসাধের কোন প্রশ্ন নেই। আমরা তো রক্ত মাংসের মানুষ নই আমরা যে ডাক্তার। কলকব্জাধারী পূরামাত্রায় যান্ত্রিক মানব মাত্র। অনুভূতি, হৃদয়াবেগ ক্ষণিক দুর্ব্বলতা, সাধারণ মানুষের মত সুখ দুঃখ বোধ নাকি শোভা পায়না আমাদের।

আবার সবেমাত্র একটি আহত রুগীর অস্ত্রোপচার সুরু হয়েছে। ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা গত রাত্রের মত একই অপারেশন। রাত্রের কথা স্মরণ করে মনটা খিঁচিয়ে উঠল। হঠাৎ সাঙ্কেতিক খবর (Signal message) এল। মেজর আইভস্ (Ives) ফোন্ ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের উপর কে যেন কালীর এক পোঁচ লেপে দিল। বুঝলাম ব্যাপার কঠিন।

ফিরে দাঁড়িয়ে মেজর বললেন "রায়, দু' ঘণ্টার মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। জাপানীরা সপ্তম ডিভিশন প্রধান ঘাঁটি (Head quarters) সাফল্যের সহিত আক্রমণ করেছে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু নৈরাশ্যজনক নহে (Situation serious but not hopeless)। তুমি কিছু মনে কোরনা। আমি "স্টেশন স্টাফ গাড়ীতে" (Station staff car) যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন ওয়ার্ড (ward) হাটন্ (Hutton)

এবং মেজর ভার্জ্জিনকে (Virgin) নিয়ে। খোঁজ খবর নিয়ে ভবিষ্যৎ আশ্রয় যোগ্য আবাস স্থল ঠিক করতে। তুমি সব যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জাম এবং লোকজন নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে বউলী বাজার রওনা হয়ো। তিনখানা মোটর লরী রেখে গেলাম, কাল সেখানে দেখা হবে।” সরে এসে কানে কানে বললেন “আমরা শ্বেতাঙ্গ, জাপানীরা আমাদের বন্দী করলে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করবে, তুমি ভারতীয় তোমার উপর অত্যাচার হবেনা হয়তো ছেড়েও দিতে পারে গুড বাই এবং গুড লাক্—“Good bye and good luck”

এই বিদায় বাণী নিয়ে ইউরোপীয় অফিসারগণ স্টাফ কারে দ্রুত রওনা হলেন, ভাবটা যেন জাপানীরা আর একখানা মোটরে তখনি তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনে রত। মেজাজ তখন সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের ওপর গরম হয়ে উঠল। মনটা গেল বিষিয়ে। কিন্তু ভেবে দেখলাম মেজর আইভস্ যদি আমাকে হুকুম করতেন তবে তাই আমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হ'ত। তাঁর সাহেবী মর্য্যাদাও তাতে অক্ষুণ্ণ থাকত। আর যাই হোক লোকটির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য দোষ দেওয়া যায়না বরং তাঁর মন খোলা স্বীকারোক্তির সংসাহসের প্রশংসাই করতে হয়। গত রাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দিনের আলোয় এই রুগীটিকে ফেলে পালাতে পারলাম না। অপারেশন শেষ করে অন্যান্য সার্জ্জিকেল রুগীদের সঙ্গে তাকেও পশ্চাদ্ভাগ রক্ষীদলের (rear party) হাতে সমর্পন করে

গেলাম। তারা দু' একদিন পর এই সব রুগীদের নিয়ে যাত্রা করবে, পিছনের দিকে যদি এর মধ্যে জাপানীদের বন্দী শিবিরে অতিথি না হয়। তারপর সুরু হল "জেনোফোণের দশ সহস্রের প্রত্যবর্ত্তনের মত ঐতিহাসিক পশ্চাদপসরণের পর্ব্ব। প্রাথমিকত্ব প্রাপ্ত (priority) ইউনিট সমূহ আগে যাবে। এই রকম প্রাথমিকত্ব প্রাপ্ত ইউনিট নিয়েই আট মাইল লম্বা এক কন্‌ভয় (convoy) তৈরী হল। বউলী মংডো রাস্তার (bawli mangdaw road) উপর আট মাইল লম্বা এই মোটর কনভয় দাঁড় হল।

মাইলের পর মাইল ছেয়ে কাতারে কাতারে নানা আকারের মোটর গাড়ীর ভীড়, জিনিষ পত্র আর লোক বোঝাই' সবাই ছায়া মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক আশে পাশে পাহাড়ের আড়ালে ঝোপের ভেতর জাপানীর মেশিন গান্ লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যুর দূতরূপে'। কাকে কখন টেনে নিয়ে যাবে কেউ জানেনা, এ যেন জীবন মৃত্যুর সাক্ষাৎ লুকোচুরি খেলা। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে এল। বিপদের মধ্যে দুঃখের রাত্রি আর শেষ হয়না।

অদূরে বোমারু বিমান থেকে প্রক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণের ভীতিপ্রদ আওয়াজ, কোথাও মাটির পাহাড়ের কোণ ধ্বসিয়ে দিচ্ছে অন্য কোথাও আবার দাবানলের সৃষ্টি করে চলেছে। পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের উপর ডাইভ (dive) করে নিচে নেমে এসে মেশিন গানের গুলি চালাচ্ছে, নয়তো হাতবোমা

ছুঁড়ে মারছে। ঘন মসীলিপ্ত অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। কোলের মানুষ চেনা যায়না। শুধু নানা রকম ইঞ্জিন এবং গোলাগুলির শব্দ চলন্ত জীবনের সাক্ষী দিচ্ছে। রাস্তার মাঝামাঝি জাপানীরা রাস্তা বন্ধ করে (road block) দু'দিকে দুটি মেসিনগান বসিয়েছে অদূরস্থিত ঝোপের অন্তরালে। আবার অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ জঙ্গলের ভেতর থেকে মর্টারের (mortar gun) গোলা বর্ষণ করছে রাস্তা লক্ষ্য করে। কার লরী কখন গোলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে তার ঠিক নাই।

মধ্য রাস্তার নিকট পৌঁছে আমার মোটর লরীর ড্রাইভার ধরমদাশ খবর দিল সাহেব গাড়ীতে পেট্রোল নেই কি উপায় করব।" তখন মনে হল উত্তেজনক পরিস্থিতির মধ্যে সেই দিন অপরাহ্নে রওনা হবার আগে পেট্রোল ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করিনি। এখন পেট্রোল পাবার কোন উপায়ই তো নাই। নেমে পার্শ্বস্থিত নালা দিয়ে অতি সন্তর্পণে [illegible] দশ গজ এগিয়ে যেতেই দেখি একটি লরী গো[illegible]র আঘাতে ঘায়েল হয়ে নালার বুক জুড়ে পড়ে রয়েছে। ড্রাইভারটি নিহত, তার দেহের অর্দ্ধাংশ সীটের উপর পড়ে রয়েছে। দেহের উপরার্দ্ধ মাথা সমেত বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তার একপাশে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কি ভয়াবহ অঙ্গচ্ছেদন? শরীরটা শিউরে উঠল, প্রতি লোমকূপে রোমাঞ্চ জাগিয়ে। আত্মরক্ষার প্রেরণা তখন ভূতের মতন চেপে বসেছে মগজে।

মালয় থেকে ৪২ সালে বেঁচে ফিরে এসেছি কি আরাকানের এই জঙ্গলে প্রাণ দিতে? মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। ডাক্তারী যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে রবারের এক লম্বা নল (rubber tubing) বের করে বিধ্বস্ত লরীর পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল চুষে নিলাম রবারের ঐ নলযন্ত্রের (syphon) সাহায্যে। একেই বলে "কারো সর্ব্বনাশ আর কারো পৌষমাস।"

তাতেও রেহাই নাই, মাইল খানেক আরো এগিয়ে যাওয়ার পর সেই মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে একটা উচ্চকিত আওয়াজের সঙ্গে ধোঁয়া বের হতে লাগল। মনে হল করবুরেটারে তেল পার হচ্ছেনা এই রকম একটা কিছু। ঠিক সেই সময় মোটর সাইকেল করে এক সুবেদার সাহেব যাচ্ছিলেন। তিনি ইঞ্জিনের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি স্যার, কি ব্যাপার?" বরাৎ নেহাত ভাল, ভদ্রলোক একে বাঙ্গালী তার ওপর আবার ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের লোক। ব্যগ্রতার সঙ্গে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, ইঞ্জিনের এই অবস্থায় বউলী বাজার পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারব কিনা? ভদ্রলোক দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তা যেতে পারবেন বোধ হয় তবে ইঞ্জিনের আর কোন পদার্থ থাকবেনা অধিকাংশ বল বেয়ারিং (ball bearing) গলে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে হুকুম দিলাম "সব কিছু গলে পুড়ে যাক যেমন করেই হোক গাড়ী চালাতেই হবে, যদি গাড়ী বন্ধ হয় তবে তোমার জন্য

আমরা কেউ অপেক্ষা করবনা তাই বুঝে হুঁসিয়ার হয়ে চালিও।" সর্ব্বক্ষণ মনটা উৎকণ্ঠা আকাঙ্খা এবং অস্বোয়াস্তিতে ভরে রইল, অন্য অনেক গাড়ী আমাদের পিছনে রেখে একটু অনুকম্পার দৃষ্টি হেনে আগে বেরিয়ে গেল। যাই হোক কোন রকমে রাত্রি শেষে বউলী বাজার পৌঁছালাম। কিন্তু পথে শত্রুর মেশিন গানের গুলি এবং মর্টারের গোলার আঘাতে সঙ্গীসংখ্যা দুচারজন কমে গেল। এই কয়েক ঘণ্টা আগে যাদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলাম একসাথে একই কন্‌ভয়ে আসছিলাম হঠাৎ তারা চোখের সামনে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলে পড়ল, সে যে কি অনুভূতি তা ভাষায় প্রকাশ করব কি করে?

অত রাত্রে আর মেজর সাহেবের খোঁজ করলাম না। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যে যেখানে পারলাম, উম্মুক্ত প্রান্তরে, বৃক্ষছায়ায়, পার্ব্বত্য নদীর শুষ্ক শীর্ণ বালুচরে, পাহাড়ের কোলে, নালার বুকে, ভূগর্ভে সবাই ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে দিলাম। দিনের আলোকে দেখি সহস্র সহস্র লোক সেখানে চারিদিক থেকে এসে জমায়েত হয়েছে 'বহুদিনের পরিচিত দু'চার জনের সঙ্গে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল। সে এক বিচিত্র আনন্দ মিলন। মৃত্যুর কোলে দাঁড়িয়ে মিলন আনন্দের অনুভূতি উপহাসের মত শোনায় কিন্তু অস্বীকার করব কি করে অন্তরের সেই অনুভূতিটুকু? হতভাগ্য এই সাথীদের দুরবস্থা দেখে নিজের দুঃখ বোধ অনেকটা লাঘব হলো। জাপানীদের

অতর্কিত নৈশ আক্রমণের ফলে যে বিপদসঙ্কুল বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয় এ তারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পায়জামা জাঙ্গীয়া বা অন্য কোন রকম লজ্জানিবারণের যৎসামান্য বস্ত্রাবরণ মাত্র সঙ্গে নিয়ে শুধু প্রাণটি হাতে করে পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে নদী নালা সাঁতরে ফিরে এসেছে। অনেকে আবার দিকভুল করে সরাসরি শত্রু শিবিরের সীমানায় গিয়ে বন্দী হয়েছে। দু'চার জন অনাহারে অনিদ্রায় সপ্তাহ কাল পাহাড়ের কোল আশ্রয় করে বন জঙ্গলের আড়াল দিয়ে, নদী নালা পার হয়ে জীবন্ত কঙ্কালের মত ছায়া স্বরূপ কায়া নিয়ে এসে পৌঁছেছে। দু-একজন আবার সম্পূর্ণ রূপে উন্মাদ হয়ে সব রকম অনুভূতির বাইরে চলে গিয়েছে।

এই প্রকার একটি ঘটনা আজো আমার মনে গভীর ভাবে আঁকা রয়েছে। দুই বন্ধু বোমারু বিমানের আক্রমণের সময় এক ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা থাকার পর অধৈর্য্য হয়ে এক জন উকি মেরে দেখতে উঠে ব্যাপার কি? আর বন্ধু তার দেরী দেখে বলে "কি দেখছিস এতক্ষণ মাথা বের করে, গর্ত্তের ভেতর শুয়ে পড়।" কোন উত্তর না পেয়ে বন্ধুর পা দুটো ধরে একটান মারতেই মস্তক শূন্য দেহটা ঝুপ করে তার উপর পড়ল! বোমার এক টুকরা কুঁচি (splinter) তার মাথাটা দেহচ্যুত করে নিয়ে যায়। এই অভাবনীয় দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হবার পূর্ব্বেই সে এক চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়—জ্ঞান হবার পর থেকেই সে উন্মাদ।

চার

জাপানীদের অতর্কিত নৈশ আক্রমণের প্রাণভয়ে ভীত হয়ে এদিক ওদিক পালাবার সময় অনেকেই তাদের যাবতীয় জিনিষ পত্র পোষাক পরিচ্ছদ পিছনে ফেলে রেখেই পালাতে বাধ্য হয়েছিল—সে কথা আগেই বলেছি। এখন তাদের দুরবস্থা দেখে কি যে করব ভেবে পাইনা। চারিদিকে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। কারো পরিধানে সামান্য একটা পায়জামা, কারো গায়ে শুধু মাত্র গেঞ্জী, কারো পায়ে জুতা নেই কারো মাথায় টুপী নেই। তবু তাদের মধ্যেই আমার পূর্ব্ব পরিচিত দু-চার জনকে আমার সংগে নিজস্ব জিনিষপত্র যা কিছু ছিল কিছু কিছু ভাগ বাটোয়ারা করে দিলাম। কেউ পেলে বালিশ ও কম্বল কেউ নিল বিছানার চাদর এবং তোয়ালে, অপরকে দিলাম বুশ কোট ও প্যান্ট, উদ্বৃত্ত জুতা, স্লিপার এবং স্লিপিং স্যুট। সেদিন তাদের সাহায্য করতে পেরে যে আনন্দ আমার হয়েছিল সে রকম আনন্দ জীবনে আর কোন দিন পাবো কিনা জানিনা। নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল।

কিছুদিন আগে যে সব জিনিষ সখের সঙ্গে তৈরী করে একান্ত নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সঙ্গোপনে যত্ন করে তুলে রেখেছিলাম, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাদের উপর কোন মায়া বা দাবী রাখবার স্পৃহা দূর হয়ে গেল, এরা যে আমার তাও মনে

হল না। সব চেয়ে বড় প্রয়োজনের সম্মুখে, বৃহত্তর দুঃখ, অভাবের সংস্পর্শে এবং সংঘাতে নিজের সত্বা বুঝি এমনি করেই লুপ্ত হয়ে যায়। সর্ব্বস্ব হারালেও বুঝি এখন মনে আর ক্ষোভ বা দুঃখ থাকবেনা। মনে পড়ল কবিগুরুর কথা

"হে অশান্ত হৃদয়, তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"—

এখানেও শত্রুদের বিমান কর্ম্মতৎপরতার অভাব নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান বাজপক্ষীর মত নীচে শিকারের উপর ছোঁ মারবার চেষ্টা করছে। এই আকাশে মেঘের আড়াল থেকে বেরুল। পরমুহূর্ত্তেই চোখের পলকে ঝুপ করে নীচে নেমে আসছে উল্কাবেগে—সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হচ্ছে মেশিন গানিং। আমরা যে জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সে একটা casualty clearing station হাসপাতাল। জাপানীরা বিমান থেকে পুস্তিকা (leaflet) বিলিয়ে গেল অবিলম্বে রেডক্রশ চিহ্ন দিয়ে চতুর্দ্দিকের সীমানা নির্দ্দেশ করতে এবং কোন রকম যুদ্ধরত সৈন্য অথবা যুদ্ধোপযোগী সাজ সরঞ্জাম সেই সীমানার ভেতর আশ্রয় না দিতে। আন্তর্জ্জাতিক জেনেভা বৈঠকের নিয়মানুসারে কোন রেডক্রশ চিহ্নিত পতাকার ৮০০ গজের ভেতর, যুদ্ধরত সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র আশ্রয় দেওয়া নিষিদ্ধ।

আমাদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ উত্তেজনা এবং কর্ম্মপ্রবাহের তৎপরতার স্রোত বয়ে গেল। যেখানে যত শালু, লাল রংয়ের কাপড় ছিল তাই জোগাড় করে চারিদিকের পাহাড়ের

চূড়ায় চূড়ায়, বৃক্ষের আগায় এবং সমস্ত তাঁবুগুলির উপর ছোট বড় নানা রকমের রেডক্রশ পতাকা চিহ্নে ভরে উঠল। আমাদের এই রেডক্রশ চিহ্নিত নির্দ্দিষ্ট সীমানা ছাড়া আশে পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, তার উপর জাপানী বোমারু বিমান বহরের তাণ্ডব লীলা সুরু হল। আমাদের মাথার উপর দিয়ে তারা বহুবার গিয়েছে কিন্তু একটি বারও ঐ জায়গাটুকুর ভেতর বোমা বর্ষণ হয়নি। বোমার বিপুল আঘাতে পাহাড়ের চূড়া ধ্বসে যাচ্ছে। মাটির টিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে নিরেট ধূলির ঝড় বইছে; কোথাও বনানীর মধ্যে দাবানল ধূম্রজালের সৃষ্টি হচ্ছে শুষ্ক অগভীর নালার বুকে সুগভীর পুকুর তৈরী হচ্ছে। নিরীহ গ্রামবাসীর দু' একখানি কুটীর, তাদের যা কিছু অবলম্বন মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হচ্ছে।

একদিন পাহাড়ের উপর থেকে দেখি শ্রেণী বদ্ধ ভাবে কাতারে কাতারে আবাল বৃদ্ধবনিতা বুকফাটা করুণ আর্ত্ত-নাদে আকাশ বাতাসকে মথিত করে; নিজস্ব স্বল্পাবশিষ্ট অবলম্বন, পোঁটলা পুঁটলী দু'চারটি গৃহপালিত পশু সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে আবাল্য পরিচিত ক্ষেত ক্ষামার ছেড়ে রাস্তা ধরে ছুটে পালাচ্ছে। আতঙ্কীভূত ভয়চকিত চাহনী দিয়ে পিছনে ফেলে থাকা ভস্মীভূত কুটিরটিকে একবার শেষ দেখা দেখে চোখ মুছতে মুছতে হয়তো জন্মভূমি থেকে চিরজন্মের মত বিদায় নিল। কি এদের অপরাধ? এরা তো যুদ্ধ চায়নি? অথচ এদেরই নির্ব্বিরোধী জীবনে ঘটল সবচেয়ে

বড় যুগান্তকারী বিবর্ত্তন যখন কোন কিছুর অর্থ আমাদের বোধগম্য হয়না—আমাদের ধারণা, উপলব্ধি এবং আয়ত্তের বাইরে, আমাদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি এমনই যে, অন্ধভাবে আমরা হয় ভগবান নয় অদৃষ্টের দোহাই দিই। আমি তাই "কালচক্র নিয়ত ঘুরিছে, সেই চক্রে নিপতিত মোরা" এই বলে মনের গতির মোড় ফিরিয়ে দিলাম।

জাপানী বিমান থেকে এই সময় পুস্তিকা বিতরণ করত। যারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য বা অনন্যোপায় হয়ে বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, নেতাজী সুভাষ বসুর অধীনে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" বাহিনীতে যোগদান করবার জন্য আহ্বান এবং নির্দ্দেশ দিয়ে। তখন অবশ্য আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাদের ত্যাগ এবং দেশপ্রেম, তাদের কর্ম্মপদ্ধতি সরকারী বাধা নিষেধ, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের গোপন সতর্ক দৃষ্টি এবং সামরিক প্রচার বিভাগের প্রচার কার্য্যের কলা কৌশলের লৌহকঠিন প্রাচীরের অবরোধ ভেদ করে আমাদের সামনে নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রকাশ করতে পারেনি। সরকার পক্ষ থেকে সংক্ষেপে এদের জিফস্ (jiffs) বলা হত। japanese indian fighting force—জাপানের তাঁবেদার ভারতীয় সৈন্য।

তবে মাঝে মাঝে আহত জাপানী বন্দীদের সঙ্গে দু-এক জন জিফ্ আখ্যাভূষিত, আজাদ হিন্দ ফৌজের আহত সৈনিক বন্দী, রুগী অবস্থায় পেয়েছি। এদের বেশীর ভাগই

১৯৪২ সালের আরাকান যুদ্ধে রথিডং ইন্দিন্ এবং ডন্ বেকের যুদ্ধক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয়ের পর অসহায় অবস্থায় পরিত্যক্ত ১৪ নং ভারতীয় ডিভিশনের (14 Indian division) অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব বাহিনীর সৈনিক। এদের মুখে শুনেছি নেতাজী সুভাষ বসু তখন আকিয়াবে তাঁর হেড কোয়ার্টার্স করেছেন। বাঙ্গালী শুনলেই এদের চোখে মুখে ফুটে উঠত সম্ভ্রমের ভাব, একটা সাদর সম্ভাষণের ইঙ্গিত। বুকটা গর্ব্বে তিন ইঞ্চি ফুলে উঠত। তবে প্রহরী বেষ্টিত এই সব আহত বন্দীদের সান্নিধ্যে যাওয়া এবং কথা বলা দুঃসাধ্য ছিল।

"আজাদ ব্রিগেড" "নেহেরু ব্রিগেড," "গান্ধী ব্রিগেড" "সুভাষ ব্রিগেড" 'ঝান্সী ব্রিগেড' তাদের সৈন্য সংখ্যা, অবস্থান এবং কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সরকার পক্ষ গোপনে সাপ্তাহিক ভাবে (weekly intelligence summary) উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারদের আবশ্যকীয় খবরাখবর দিতেন। এদের অবশ্য দল ত্যাগী, বিশ্বাস ঘাতক, দেশদ্রোহী এবং জাপানের তাঁবেদার বলে প্রচার করা হত। সাধারণ সৈনিক এ সম্বন্ধে জন সাধারণের মতনই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।

দেশ মাতৃকার উদ্ধারের জন্য বহুবীর সুযোগ পেলেই এ বাহিনীতে যোগদান করেছেন এবং স্বাধীনতার বেদীতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। বহুকাল পূর্ব্বেই ভিক্ষা পাত্র হাতে করে, আবেদন ও নিবেদন করে, স্বাধীনতা যে আমরা অর্জ্জন করতে পারবনা এবিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কোনকালে

কোন দেশে তা হয়নি, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবেনা। সত্যিকার আশা রাখতাম গতযুদ্ধের শেষে তুর্কী যেমন কামাল পাশার নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছিল, নেতাজী সুভাষ বসুর অধিনায়কত্বে ভারতবর্ষ এইবার স্বাধীনতা লাভ করবে। আমরাও আমাদের এই কষ্টার্জ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে এবং সেবায় নিয়োগ করতে পেরে ধন্য হব।

পাঁচ

এখানেও আবার চিরন্তন গর্ত্ত খোঁড়া সুরু হল। তার উপর জঙ্গলের রংএ রং করা তাঁবু খাটান হল। তিনদিনের দিন হুকুম এল আমাদের অবরুদ্ধ সৈন্য বাহিনীদের উদ্ধারার্থ নতুন ২৬নং ভারতীয় ডিভিশন এসেছে। তাদেরই সঙ্গে আমাদের যেতে হবে সেই সাবেক জায়গার প্রায় কাছাকাছি, তবে বিপরীত দিকে এবং সম্পূর্ণ ঘোরা পথে। এবার পায়ে চলা পাহাড়ী জঙ্গলের রাস্তা। সঙ্গে ভারবাহী পশু অশ্বতর (mole) হাসপাতালের জিনিষপত্র এবং সাজ সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাবে।

জাপানী আক্রমণ এবং অবরোধের পূর্ব্বে "মায়ূ" পর্ব্বত-মালার পূব থেকে পশ্চিম পারে খাদ্যদ্রব্য রসদ আগ্নেয়াস্ত্র সব কিছুই মোটর লরীতে যাতায়াত করত নাগিডক গিরিবর্ত্ম দিয়ে। হঠাৎ সেই গিরিবর্ত্ম (ngeykedak pass) অবরুদ্ধ হওয়ায়

ঘোরাপথে পাহাড়ী রাস্তা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলনা। মোটর গাড়ী থেকেও রাস্তা অভাবে অচল এবং অকর্ম্মণ্য হওয়াতে ভারবহী পশুর চাহিদা রাতারাতি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। সৈন্যদের রসদ, পানীয় জল, অস্ত্রশস্ত্র, ছোট কামান, গোলাগুলি, সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সবই বয়ে নেবার জন্য ভারবাহী পশুর জরুরী আবশ্যকতা হয়। নিজস্ব ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র ছোট ঝোলায় (haversack) কাঁধ থেকে পাশে ঝুলিয়ে, বড় পিঠুতে (rvck sack) করে কম্বল বর্ষাতি, মশারী দু-একটি পোষাক ও তোয়ালে পিঠে করে আমাদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অন্যদিকে কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে জলের বোতলে (water bottle) পানীয় জল। কোমরবন্ধের পিছন দিক থেকে ঝোলান টানে বদ্ধ বিশেষ প্রয়োজনীয় রসদ, (emergency ration) রসদ কৌটা (ration tin) এবং চিরসঙ্গী এনামেলের মগ (enamel mug) বিশেষ রসদের এই টিনের সর্ব্বত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। রসদ যখন অবস্থা বিশেষে পৌছুতে পারেনা তখনই এর খোলবার নিয়ম তবে সে যা খাদ্য সেটা যত না খোলা যায় ততই মঙ্গল। সর্ব্বোপরি পেটিতে আঁটা কোমরে বদ্ধ রিভলভার, কার্ত্তুজ এবং মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ।

হাসি পেল এই যান্ত্রিক যুগে কলকব্জা ছেড়ে আবার আদি যুগের মানুষের মত জানোয়ার সঙ্গী করে রওনা হওয়া দেখে। ধূসর গোধূলিতে ধূলি ধূসরিত পথে মাথায়

লোহার টুপী পিঠে বড় ঝোলা, পায়ে নলি এবং লোহার কীলকভরা বুট পট্টি পরিহিত দেহভার লাঠিতে ভর করে পায়ে চলার পার্ব্বত্য পথে চলতে সুরু করলাম। গন্তব্য স্থান মায়ু পাহাড়ের ওপারস্থিত "গোপী বাজার" যেতে হবে "গোপী গিরিবর্ত্মের" (goppe pass) ভিতর দিয়ে। গিরিবর্ত্মের এই রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং দুরারোহ। পার্ব্বত্য পথ গিরিশৃঙ্গের শিখর দেশ বেয়ে উঠে আবার নেমে গিয়েছে। ভারী বোঝা কাঁধে এবং পিঠে করে এই সব খাড়াচড়াই বেয়ে উঠতে এবং উৎরাই বেয়ে নামতে একেবারে গলদঘর্ম্ম তো হতেই হয় কখন কখন হাঁপানির মত হাঁপ ধরে টান উঠে যায়; কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিলে চলবার ক্ষমতা থাকেনা। পায়ে ভারী বুটপট্টি, তলায় লোহার নাল লাগান থাকা সত্ত্বেও মজবুত লাঠির আশ্রয় না নিলে প্রতি পদক্ষেপে পা পিছলে পড়ে যাবার আশঙ্কা। একটু এদিক ওদিক হলেই এক পাশের অতল গহ্বরে পতন অনিবার্য্য। হাঁটু সমান ধূলা, দেহভার টেনে চলাই কষ্টসাধ্য। শুধু যে পথের কষ্ট তা নয়। চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, উপরে আকাশ পথে শত্রুর বিমান বহর সৈন্য চলাচলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

এবার যুদ্ধরত সৈন্যদের সঙ্গে একই কন্‌ভয়ে যাচ্ছি কাজেই রেডক্রশ চিহ্নিত পতাকা ব্যবহার বাতিল হয়ে গিয়েছে। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে অগ্রসর হচ্ছি। বিমানের আভাষ পেলেই সটান নালার গর্ত্তে অথবা জঙ্গলের ভেতর শুয়ে পড়ছি।

চারিদিকে শুকনো পাতা ঝর ঝর করে পড়ছে ; বুনো লতা সর্ সর্ করে রাতের হাওয়ায় দুলছে। নিশির শিশির বিন্দু টপ টপ করে ঝরে পড়া শুকনো পাতার উপর পড়ে শত্রুর পদধ্বনির মত শোনাচ্ছে। বন্য পশুর ভীতিপ্রদ আওয়াজের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হচ্ছে এর সাথে। এই সব কিছুই মনকে সদা সচকিত এবং সশঙ্কিত করে তুলেছিল।

কেউ জানেনা কখন এই জঙ্গলের আড়াল থেকে জাপানী স্নাইপারের (Sniper) একটি বুলেট্ ইহকালের এই যাত্রা শেষ করে দেবে। বন্য জন্তুর আওয়াজে ভীত এবং আতঙ্কিত হবার বিশেষ কারণ ছিল। জাপানী পরিভ্রমণকারী সৈন্য (Patrol troops) আমাদের ব্যূহের সীমানা, সৈন্য সংখ্যা সমাবেশ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তারপর চতুর্দ্দিকের বিভিন্ন এই দল নানা রকম বন্য জন্তুর আওয়াজ করে নিজেদের মধ্যে তাদের আগমন এবং স্থিতির আভাষ ও ইঙ্গিত দিত। বিশিষ্ট বন্য জন্তুর স্বর তাদের গোপন সঙ্কেতের কাজ করত।

অনেক সময় বন্য শিয়ালের ডাকে আকৃষ্ট হয়ে ঔৎসুক্য দেখাতে গিয়ে আমাদের দুচার জন সৈন্য জাপানীদের হাতে নিহত হয়েছে। আবার কখনো তারা দুজন অথবা চারজন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে জঙ্গলে ঢাকা প্রস্তর স্তূপের অন্তরাল থেকে একটি অটোমেটিকের (Automatic)

আওয়াজ করত আমাদের সৈন্য সীমানা (Line) লক্ষ্য করে। অমনি আমাদের সৈন্যগণ স্নুরু করে দিত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ, সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। তারা কিন্তু নিঃশব্দে সরে পড়ত সীমানার অন্য দিক থেকে সেই একই ভাবে, তারা আমাদের সৈন্যদল থেকে গুলীবর্ষণ আদায় করে নিল।

এইভাবে গুলীর তীব্রতা এবং পরিমাণ দেখে, জাপানী সৈন্যরা আমাদের সৈন্য সংখ্যা সমাবেশ এবং 'বূ্যহ' রচনা প্রণালী বুঝবার চেষ্টা করত। আবার কখনো আমাদের গোলাগুলি অনর্থক নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে হয়তো দুটি জাপানী সৈন্য দুটি মেশিন গান নিয়ে সমান্তরাল পর্ব্বত শ্রেণীর উপরে উঠে তাড়াতাড়ি পূব ও পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েই পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের জঙ্গলে গা ঢাকা দিত। পরক্ষণেই আবার পাহাড়ের উপর উঠে তাড়াতাড়ি উত্তর, দক্ষিণ লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে চুপ হয়ে থাকত। স্বভাবতঃই সৈন্যদের ধারণা হত যে আমরা চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছি। তার ফলে যে পরিমাণ গোলাগুলি চলে তার পরিমাপ করা মুস্কিল। শেষে ফল হয়তো কিছুই হ'লনা কিন্তু দুটি মাত্র জাপানী সৈন্য পারতপক্ষে প্রায়ই তারা সরে যায় নয়তো বা কদাচিৎ প্রাণ হারায়। দুজন মাত্র জাপানী সৈন্য দ্বারা এইভাবে এক গুরুতর পরিস্থিতির এবং আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হয়।

ছয়

এই সূত্রে একটি ঘটনা মনে পড়ল। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ক্যাম্প পড়ে। উপাধ্যায় নামধারী এক ভারতীয় পাচক (Cook Indian Troops) আজন্মার্জ্জিত অভ্যাস অনুযায়ী সামরিক আইনের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে "অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য ক্যাম্প থেকে অনেকটা জঙ্গলের ভিতরে যায়। সেখানে সে দুটি জাপানী সৈন্যকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে, পায়খানা তার মাথায় উঠে যায়। কর্ণদেশে দোদুল্যমান উপবীত এবং মুক্ত কচ্ছ অবস্থায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে সে ক্যাম্পে খবর দেয় "দোঠো দুষমণ হ্যায় হুজুর" অনেক জোর জবরদস্তির পর সে দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েই উর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাদপসরণ করে। জায়গাটা আমাদের সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও ক'রে বেপরোয়া ভাবে গুলি চালাতে লাগল।

সম্ভবতঃ এই দুইটি জাপানী সৈন্য আগের দিন রাত্রে খোঁজ খবর নিতে এসে যে কারণেই হোক নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে না পেরে রাত্রের অপেক্ষায় ঐ জঙ্গলের ভেতরই চুপচাপ লুকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরেই হল এক বিস্ফোরণের শব্দ, তারপরই সবই চুপচাপ। পরে দেখা গেল জাপানীদের গুলি নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে তারা দুজন পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে কাঁধের ভেতরকার ফাঁকে হাত বোমা ফুটিয়ে আত্ম-

হত্যা করেছে। শত্রুহস্তে ধরা পড়বার লজ্জা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এই ভয়াবহ মৃত্যুকেই তারা বরণ করে নিয়েছে।

তখনো সেই পার্ব্বত্য পথ বেয়ে চলেছি। ভারবাহী অশ্বতরই একমাত্র সুখ দুঃখের সঙ্গী। এরা মোট বহন ছাড়া রসদ, পানীয় জল, গোলাগুলি, ঔষধ পত্র, যন্ত্রপাতি সব কিছু চলাচল করে। এমন কি আহত রুগীদেরও পিঠে করে বহন করে নিয়ে আসে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। একটি অশ্বতর একদিকে একমণ করে দুমণ বোঝা নিয়ে অক্লেশে এই পার্ব্বত্য পথ পারাপার করে। পিঠের ওপর রুগী ছাড়া অন্য কোন বোঝা বহন করেনা। এরাও শত্রুর গতির আভাষ পায় এবং বনান্তরালে নিঃশব্দে অবস্থান করে। পার্ব্বত্য পথে, জঙ্গলে যুদ্ধে মরুভূমির উটের মতই এরা অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য।

রাত দুপুরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম। পাহাড়ের অন্তরালস্থিত নালার পারে সমতলভূমিতে সমস্ত জিনিষপত্র অশ্বতরের পিঠ থেকে নামানো সুরু হ'ল। হঠাৎ রঙ্গীন রকেটের আলো তীব্রবেগে আকাশ পথে উঠতে দেখলাম। তারপরই শোনা গেল বিমানের শোঁ শোঁ আওয়াজ এবং পরক্ষণেই চর্ চর শব্দ। প্রথমটা চমকে উঠে এক রকম নিজের অজ্ঞাতসারেই নালার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সটান শুয়ে পড়লাম। সেখান থেকে দেখলাম নিয়মিত ভাবে রকেট আকাশ পথে উঠছে আর বিমান থেকে নানারকম জিনিষপত্র ফেলে দিচ্ছে। পরে বুঝলাম এসব "ডেকোটা" (Dakota) আমাদের সরবরাহকারী

বিমান। গভীর রাত্রে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে বস্তাবন্দী খাদ্যদ্রব্য প্যারাস্যুট প্যাকেট ভর্ত্তি মূল্যবান রসদ ঔষধ পত্র ডাক্তারী সাজ সরঞ্জাম এইভাবে সরবরাহ করে যাচ্ছে।

রকেটগুলো জিনিষপত্র ফেলবার স্থান নির্দ্দেশের জন্য আকাশ পথে ছোঁড়া হচ্ছিল। চারিদিকে পাহাড়ের চূড়া এড়িয়ে বিমান এই রকেট নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছোট সমতল ভূমিতে অথবা নালার বুকে একটা চক্কর দিয়ে জিনিষপত্র ফেলে দেয়। ছয় সেকেণ্ডের বেশী সময় এরা পায়না। বিমান নেমে ঘুরতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্কেত বাতি বিমানের ভিতরে পেছন দিকে জ্বলে উঠে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত দরজার পাশে স্তূপীকৃত দ্রব্য সম্ভার ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। এইভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বস্তাবন্দী জিনিষ উল্কার বেগে নেমে আসে। প্যারাস্যুটে বাঁধা জিনিষ-পত্র কিছুদূর বেগের সঙ্গে এসেই ছাতির মত প্যারাস্যুটটা যেই খুলে যায় অমনি তার গতি মন্দীভূত হয়। মন্থর ভাবে হেলতে দুলতে সে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। কিছু জিনিষ অবশ্য পাহাড়ের চূড়ায়, এবং বৃক্ষের শিখরে আটকে পড়ে থাকে।

যানবাহন চলাচলের সাধারণ রাস্তাঘাট শত্রু সৈন্য সমাবেশে অবরুদ্ধ। মাটির উপর অশ্বতর আর আকাশ পথে বিমান দেবতার আশীষ বৃষ্টির মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার অশ্রান্তভাবে বর্ষণ করে যায়। ম্লান চাঁদের আলোকে দূরে দু'একটা পরিত্যক্ত কুটিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি গোচর হতেই ক্লান্ত দেহ

টেনে নিয়ে কম্বল বিছিয়ে সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলে পড়লাম। হঠাৎ ভীষণ এক মড় মড় শব্দে ঘুম ভেঙ্গে চমকে উঠলাম। একটি আটা ভরা বস্তা বিমান থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের কুটিরের চালের এক কোণা ভেঙ্গে নিয়ে ভূমিসাৎ হল। ঘাম দিয়ে ভয় ছুটে গেল, ঘাড়ের ওপরপড়লেই হয়েছিল আর কি ? সাক্ষাৎ অপঘাত অপমৃত্যু। এরকম ঘটনাও বহুবার ঘটেছে।

আর একটি রাত্রি প্রভাত হল, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নালার অপরিসর জলে প্রাতঃকৃত্য শেষ করলাম, হাঁটু সমান ঘোলা জলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্নান করলাম। যে দিকে তাকাই শুধু নজরে পড়ে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বস্তাবন্দী খাদ্যদ্রব্য, রঙ্গীন প্যারাস্যুট ভর্তি দ্রব্যসম্ভার এবং সাজ সরঞ্জাম। গত রাত্রের আকাশ বন্ধুদের দান। সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় সুরক্ষিত এই দ্রব্য সম্ভার পরে সরবরাহ বিভাগে জমা হয় প্রত্যেক সৈন্য শিবিরে এবং হাসপাতালে বণ্টনের জন্য !

দ্বিপ্রহরের মধ্যেই নিজস্ব থাকবার জায়গা ঠিক করে অস্ত্রোপচার গৃহ সাজিয়ে কাজের জন্য তৈরী হ'লাম, অপরাহ্ন হতেই দলে দলে আহতরা এসে পৌঁছুতে লাগল। আমরাও যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম, সন্ধ্যার দিকে শুনলাম, এ জায়গাটি বিশেষ করে রাত্রে মোটেই নিরাপদ নয়, অদূরবর্ত্তী সমান্তরাল পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নালার বুক চেয়ে শত্রুসৈন্য প্রায়ই হানা দেয়, সুতরাং সেই রাত্রেই আবার গাঁটরী বেঁধে রক্ষী সৈন্যদল রচিত ব্যূহের ভেতর আশ্রয়

নিতে হল ; রেডক্রশ পতাকা চিহ্নও উঠে গেল। সন্ধ্যার পর কোন রকম বাতি জ্বালান এমন কি সিগারেট ধরান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। সব রকম আওয়াজ কথাবার্ত্তা বলা বন্ধ, সবাই সশস্ত্র সশঙ্কিত ভাবে বুটপট্টি পরিহিত অবস্থায় নিজস্ব গর্ত্তে আর এক রাত্রি অতিবাহিত করলাম।

পরদিন নতুন আর এক অধ্যায় সুরু হল। দীক্ষা নিয়ে ভোল বদল। সম্পূর্ণ নতুন করে পোষাকের খোলস বদলাতে হল। এখানকার জঙ্গলে সেনাপতির কড়া হুকুম সামরিকতার প্রতীক, এতদিনকার সাধের খাকী পোষাক পরিত্যাগ করতে হবে। বন জঙ্গলের উপযোগী পোষাক পরতে হবে। জঙ্গলা ঘাস, গাছ গাছড়া আর পাহাড়ের মাটীর রংএ রং মিলিয়ে তৈরী হোল রঙ্গীন পোষাক। রঙ্গীন পাঁচ পকেটওয়ালা এক লম্বা পাতলুন আর ব্লাউস কোট এই হল যুদ্ধ পোষাক। (Battle Dress) অবশ্য খাকী যাদের ছিল তাকে রং করে নিতে হল। কারো নীল, কারো সবুজ কোনটা ধূসর আবার কারো গাঢ় গেরুয়া মাটীর রং। এতো গেল যেমন তেমন, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, জাঙ্গীয়া, ইজার, তোয়ালে, রুমাল, গেঞ্জী, মশারী সব কিছুই রঙ্গীন রংএ ছোপান হল, বসন তো রাঙ্গান হল, কিন্তু মনে সত্যিকার রং ধরল কি? গুণ গুণ করে গান ধরলাম।

—"কি ভুল করিলে

মন না রাঙ্গায়ে বসন রাঙ্গালে যোগী"—।

সাত

রঙ্গীন পোষাক পরে আমরা সবাই যেন এক একটা সবল জীবন্ত রঙ্গীন আগাছায় পরিণত হলাম। কোথায় গেল ধোপ দুরস্ত ফিট্‌ফাট্ সাজগোজ, ফিটফাট এত সাধের খাকী। পালিশ করা পিতলের বোতামের এবং কোমর বন্ধের চাকচিক্য ব্যবহার করা বন্ধ, কিন্তু তখনো বুঝিনি হায় আরো কত বাকী। এর পরবর্ত্তী সংস্করণ হল তাঁবু ব্যবহার বাতিল. সহজেই শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মোটর গাড়ী অভাবে বহন করে নিয়ে বেড়ান অসম্ভব বলে, সবাই নিজস্ব ব্যবহারের জন্য "শিয়াল গর্ত্তের" (Fox hole) অনুরূপ এক গর্ত্ত খুঁড়ে বাসস্থান তৈরী করতে হল। মজার কথা এই বাসস্থানের জন্য শতকরা পাঁচ টাকা গর্ত্ত ভাড়া সরকারকে প্রতি মাসে আমাদের প্রত্যেককে দিতে হত।

চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ঘন সন্নিবিষ্ট বন্য ঝোপ কিন্তু একটি ছোট ডাল পর্য্যন্ত কাটা নিষেধ। গর্ত্তের উপরকার মুখ বন্য গাছ গাছড়া এবং মাটির ও ঘাসের চাপড়া দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর বুনো লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ঢোকবার গর্ত্ত থাকে পাশ দিয়ে খানিকটা দূরে, সহজে গোচরীভূত হয় না। মাথা নীচু করে হাঁটু ভেঙ্গে কোন রকমে প্রবেশ করে শোয়া চলে। ভূগর্ভের ভিতরে কলসীর পেটের মত দুপাশে গভীর ভাবে

গর্ত্তের বিস্তৃতি বাড়ান হয়, কিন্তু ভিতরে নড়াচড়ার কোন উপায় নেই। যে ভাবে শয়ন সেই একই ভাবে সমস্ত রাত্রি যাপন। প্রথম প্রথম দম বন্ধ হয়ে আসতো। আলো বাতাসের অভাবে মনে হত এই বুঝি জীবন্ত সমাধি হল। পরে অবশ্য সবই সহ্য হয়ে যেতে লাগল।

এই ভাবে প্রত্যেক নতুন জায়গায় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মুক্ত আকাশতলে বৃক্ষছায়ায়, পাহাড়ের আবডালে, দীর্ঘ ঝোপের অন্তরালে আমাদের গোপন গুহা বা ভূগর্ভ প্রাসাদ। এই একই ভাবে বারবার তৈরী করতে হয়। হাওয়ায় উড়ে এসে শুকনো পাতা গর্তে প্রবেশ করে; বন্য পোকা মাকড় গায়ে এসে পড়ে; গর্ত্তের দেওয়ালের আলগা মাটি ঝুপ ঝুপ করে গায়ের উপর ঝরে পড়ে। মাটির উপর ঘাস বিছিয়ে কম্বল মাত্র সম্বল করে বিছানা তৈরী হয়। তারই উপর নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে থাকবার চেষ্টা করি।

মাটির সঙ্গে এই ভাবে নিবিড় পরিচয় এই প্রথম। আর সত্যিকার উপলব্ধি করলাম মাটিই খাঁটি। সভ্যতার চাকচিক্যের বাহিরে আদিম যুগের মানবের মতই গিরি-গুহায় লুক্কায়িত গোপন বসবাস, অথচ বিশেষ কোন দুঃখ বোধ বা আরামের অভাব অনুভব হতনা, শুধু অতীতের বাঁধা ধরা আরাম আয়োজনের অভ্যাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভাবটাই বড় মনে হত। অবশ্য এর সঙ্গে যুদ্ধের বিভীষিকাই সব চেয়ে ভয় ও অস্বোয়াস্তির কারণ ছিল। মানুষ যখন সত্যিকার

বিপদের সম্মুখীন হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, সভ্যতার খোলস তখন খুলে পড়ে। মানুষ তার অন্তরের সত্যকার মানুষের পরিচয় পায়। সভ্যতারূপী যাদুকর, যাদুদণ্ড স্পর্শে আমাদের ভুলিয়ে রাখে এই সত্য রূপ ঢেকে। তাই ভয় হয় যুদ্ধশেষে মানুষ যখন আবার সভ্যতার ক্রোড়ে ফিরে যাবে তার অন্তরের খাঁটি মানুষটি জন কোলাহলে, সভ্যতার গিল্টী করা রঙ্গীন ঘোমটার আড়ালে আবার ঢাকা পড়বে।

অবশ্য অন্য দিক দিয়ে ভাবতে গেলে যতই সভ্যতার মুখোস পরি না, কেন প্রয়োজন এবং সুযোগ বুঝে সে মুখোসকে দূরে জলাঞ্জলি দিয়ে আদিম বর্ব্বরতার পরিচয় দিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইনা এমনটাই তো হয়। সুকঠিন বাস্তবের রথচক্রে আমরা বারবার নিস্পেষিত হই। সম্পদ পিচ্ছিল পথে যাত্রীদের ভীড়ে বারবার আমরা পদদলিত হই, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে সংগোপনে বেঁচে থাকে এক অতি ভীরু স্বপ্নিল মানুষ, সে অনবরত গড়ে তুলেছে এক বিরাট স্বপ্নসৌধ যা অন্তরের সম্পদের কাছে অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য। বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অঙ্ক কষা এই জীবনের এ একটা প্রচণ্ড পরিহাস এবং সুকঠিন ব্যঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে এও আবার মনে হয়, এই যুদ্ধ-জীবনের পর বোধ হয় নিজেদের শান্ত আড়ম্বরহীন পল্লী গৃহকোণ আর ভাল লাগবে না। পূর্ব্বতন জীবন ধারা ঠিক সহজ ভাবে বরণ করে নিতে পারব না। আমরা যেন কি রকম খাপছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া উদ্দেশ্যবিহীন পাঁচমিশেলী

ভবঘুরের, দলে পরিণত হচ্ছি। কবিগুরুর সেই গানও মনে পড়ল—

"খেয়ালের হাওয়া লেগে
যে ক্ষ্যাপা উঠল জেগে…।"

সন্ধ্যার মুখোমুখি রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম বাতি জ্বালাও নিষেধ। এমন কি জরুরী অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোন কাজই হত না বাতি জ্বালার অভাবে। অস্ত্রোপচার গৃহ তৈরী হত দুই পাহাড়ের ভিতর মাটির নীচে পাঁচ ছয় হাত গর্ত্ত খুঁড়ে। সেই অন্ধকার গহ্বরে অতি সন্তর্পণে বাতি জ্বেলে জরুরী কাজ করতে হত। আগে সৈনাধ্যক্ষকে খবর দিতে হত যে, আমরা বাতি জ্বেলে কাজ করছি নতুবা ব্যূহের চারিদিকে (Perimeter) অবস্থিত আমাদের সৈন্যরাই নির্ব্বিবাদে গুলি ছুঁড়বে আলো লক্ষ্য করে। অবশ্য শত্রু সৈন্যর গোলাগুলির ভয় সব সময়ই থাকবে।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এবং প্রত্যূষে সবুট, সপিঠু, সশস্ত্র অবস্থায় খাড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত, ইহাই বিখ্যাত Stand to এবং Stand down. এর উৎপত্তির কারণ হচ্ছে ভোরের আলো ছায়ায় এবং সাঁঝের আঁধারে (Dawn and dusk Attack) জাপানীরা তাদের অতর্কিত আক্রমণ চালাত। কারণ ঐ দুই সময়েই সৈন্যরা স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত কম সতর্ক থাকে, পরে অবশ্য জাপানীরা গভীর রাত্রে অতর্কিত নৈশ আক্রমণ চালাত এবং অনেক স্থলে ঘুমন্ত অবস্থায়

অনেককে তারা চিরনিদ্রার কোলে অনন্ত শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছে।

আট

আমাদের ইউনিট এবার সংযুক্ত ছিল ৪৬ নং ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে কিন্তু এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে রুগী কোন-ক্রমেই সাত দিনের বেশী রাখা হয় না, পিছনে বড় হাসপাতালে প্রত্যহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নতুবা যুদ্ধক্ষেত্র হতে নবাগত আহত সৈন্যদের স্থানাভাব হয়, দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থিত শুষ্ক সুগভীর পার্ব্বত্য নালা বেছে ঠিক করে নিয়ে তার দুই পাড় অনেকটা সমতল করে নিয়ে সম্পূর্ণ নালাটার বুক ঘিরে গড়ে ওঠে হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ, দুই দিকের মাটির দেওয়ালে গর্ত্ত করে সেলফ তৈরী হয়, ঔষধ পত্রের শিশি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম রাখবার জন্য।

বন থেকে দুফেঁকড়া (Forked) গাছের ডাল এবং কাস্তা করা বাঁশের খুটী পুঁতে তার ওপর ষ্ট্রেচার লাইন বরাদ্দে বসিয়ে রুগীদের জন্য বিছানা (Bed) তৈরী হয়। ওপরে লম্বা লম্বা পাতলা ঘাস, লতাপাতার ঢাকনী দিয়ে ছাউনী তৈরী হয়। এতে করে শুধু রোদ খানিকটা আটকায়, অস্ত্রোপচার গৃহের কথা আগেই বলেছি, আর সঙ্গে ছিল "ব্লাড ট্রান্সফিউশন্ ইউনিট" (Blood Transfusion Unit) এই হল পুরো ফিল্ড হাসপাতাল।

চার পাঁচ দিন পর আবার এগিয়ে চললাম। এবার চলেছি অধুনা জাপানী অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে, তারা পশ্চাদপসরণ করছে আর আমরা তাদের অনুসরণ করে এগোচ্ছি, অনেকটা কাণামাছি খেলার মত, কোথাও থাকবার স্থিরতা নেই। আজ একটা জায়গা আমরা উদ্ধার করলাম আবার দুদিন পর জাপানীরা পুনরায় তাকে দখল করে নিল। আজ আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিন মাইল পিছনে রয়েছি আবার একরাত্রির মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ আমাদের তিন মাইল পিছনে দু-তিন দিন ধরে চলছে। গোপী, বদানা প্রিংচং, টঙ্গুবাজার, কোথাও দুদিন, কোথাও চারদিন, এ সব জায়গায় [illegible]রা সুবিধা পেলেই পার্শ্বদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে হানা দিতে [illegible] করেনি।

একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, সন্ধ্যার পর [illegible] তার গর্ত্ত ছেড়ে বেরুতে পারবে না বিশেষ সাঙ্কে[illegible] শব্দের সাহায্য ছাড়া। (Pass and Counter Password) প্রত্যহ এই ডবল সাঙ্কেতিক শব্দ ইংরেজী এবং উর্দ্দু এই দুই ভাষায় বদলী হচ্ছে। রাতের আঁধারে কেউ কাউকে চিনতে পারে না, চলাচল সন্দেহজনক ; কাজেই কোন শব্দ বা মানুষ চলাচল অনুভব করলেই রক্ষী প্রহরীরা নির্ব্বিবাদে গুলী চালাবে তাকে লক্ষ্য করে, সে শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক।

আবার জায়গা বদল। আবার সেই চিরন্তন গর্ত্ত খোঁড়া

পথচলার সঙ্গী সেই অশ্বতর সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। গর্ত্ত খোঁড়া ছাড়া উপায় নেই। বোমা ও শেলের টুকরো থেকে বাঁচবার এই একমাত্র অবলম্বন এবং নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। জীবন্ত অবস্থায় মাটির সঙ্গে নিবিড় এই পরিচয় জীবনে এই প্রথম। সহরের বুকে যা এতকাল নোংরা এবং সযতনে পরিহার্য্য বলে জেনে এসেছি তাই আজ হয়ে উঠল একান্ত আপনার, অপরিহার্য্য। জননীর মত স্নেহে মূক ধরিত্রীমাতা কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। মানুষ যদি প্রাণঘাতী বিপদের মাঝখানে এত অল্পেও সন্তুষ্ট থাকতে পারে তবে দৈনন্দিন সহজ জীবন যাত্রার মাঝে কেন এই সব বাহ্যাড়ম্বর এবং বহ্বারম্ভ? নাগরিক সভ্যতার বুকে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে সার্থকতা লাভ করার আপ্রাণ প্রয়াস।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কথা—অতি প্রত্যূষে জঙ্গলের ভিতর গর্ত্ত পায়খানায় অপরিসর কর্দ্দমাক্ত নালার জলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করার পরই Stand to. তারপর আগত আহতদের বিশেষভাবে রক্ষিত রক্ত বা রক্তের অংশ দান; (Blood or Plasma) অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসা; তারপর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পিছনকার বড় হাসপাতালে তাদের স্থানান্তরণ। যুদ্ধক্ষেত্র হতে সদ্য আগত আহতদের প্রাথমিক জরুরী চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার শেষ হলেই তাদের পেছনের হাসপাতালে পাঠিয়ে ফিল্ড হাসপাতাল খালি করতে হত। কারণ অসংখ্য আহতরা আসছে।

প্রয়োজনীয়তা বুঝে বিমান যোগে রোগী পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল, তারপর নানা রকম খুঁটিনাটি কাজে দিন কেটে যায়। পারত পক্ষে রাত্রে জরুরী কেস্ ছাড়া অপারেশন করা হোত না বাতি জ্বালার ভয়ে। কিন্তু সব চেয়ে কষ্টকর বিপদসঙ্কুল জীবন হচ্ছে ষ্ট্রেচার বাহকগণের (Stracher Bearers)। দুর্গম জায়গায় সটান যুদ্ধক্ষেত্র হতে দুরারোহ পার্ব্বত্যপথ সাত আট মাইল পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে আহতদের কাঁধে করে এরা বহন করে আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত বা নিহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর থেকে জাপানী স্নাইপারের বুলেটের ভয় আছে। পাহাড়ের আড়ালে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলার পথ, রাত্রের অন্ধকারের তো কথাই নেই, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না; কোন রকম পদশব্দ বা ন্দহ-জনক আওয়াজ হলেই গুলি চলবে। এদের সাহস ও র্য্য অতুলনীয়। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে জাতি র্ম্ম নির্ব্বিশেষে আহতদের এরা সেবা করে যাচ্ছে, অথচ উ এদের কথা মোটেই ভাবে না। কারণ এরা যে তি সাধারণ নগণ্য লোক। এরা চিরকাল যবনিকার অন্তরালে থেকে "হাই-ফেনের" কাজ করে যায়। জগতে নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য পালন এবং পরোপকারের এই হয়তো ন্যায্য প্রাপ্য।

সমস্ত দিনটা কাজ কর্ম্মে কেটে যায়। বিকেলে নালার জলে—অবশ্য যদি সহজ প্রাপ্য হয়, স্নান শেষ করতে হয়। সেই নালার জলে জানোয়াররাও স্নান করছে। আবার

অনেকে বিশেষ করে গোরা সৈন্যরা প্রকৃতির কোলে প্রথম শিশুর মত জলক্রীড়া করছে। প্রথমে গা ঘিন্ ঘিন্ করতো, তারপর দুদিনেই আবার গা সওয়া হয়ে যায়। আবার যেখানে নালা শুষ্ক, জল নেই সেখানে এই কাকস্নান থেকেও বঞ্চিত থেকে যেতে হয়। সন্ধ্যার আগেই আহার শেষ করতে হয়। আবার Stand to—তারপর দীর্ঘরাত্রি, অন্ধকারময় বিভীষিকা অথচ সমস্ত রাত ভূগর্ভে বন্দী থাকতে হয়, ভয় এবং উৎকণ্ঠা ভরা এই রজনী আর শেষ হতে চায় না—তার উপর দুঃস্বপ্ন তো লেগেই রয়েছে। নিশীথের হাওয়া শুষ্ক লতায় পাতায় মর্ম্মর তোলে; আঁধারে ছায়ায় ছায়ায় কাদের যেন অস্পষ্ট পদধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসে। রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কামানের গর্জ্জনে এবং শেল বিস্ফোরণের শব্দে কাণে তালা লেগে যায়। মাটির কোটরে আর পৃথিবীর বুকে জাগে প্রবল কাঁপন। ঝুপ ঝুপ করে খসে যাওয়া শুক্নো বালি মাটি শরীরের উপর বেশ একটা ঘন আচ্ছাদন তৈরী করে দিয়ে যায়। তারপর কখনো কখনো ব্যাপার যখন বেশ ঘোরালো রকমের হয়ে ওঠে, বুট পট্টি ভাল করে এঁটে, মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চড়িয়ে রিভলভার বাগিয়ে অদৃশ্য শত্রুর অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী পোহাতে হয়, শরীরের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী এত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে যে সামান্য শব্দেই নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে রিভলভার জোর করে চেপে ধরে বসে আছি তার কোন

ঠিক ঠিকানা থাকে না, হঠাৎ খেয়াল হয় তাই তো! মুষ্টি শিথিল হয়ে আসে, আবার ঘুমাবার চেষ্টা করি, একটার পর একটা দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি এসে মনের দরজায় ভীড় করে দাঁড়ায়। দিনের আলো অনেকটা সাহস ও স্বচ্ছন্দতা ফিরিয়ে আনে; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই মনটা আবার বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে, দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই ভাবে কাটে যুদ্ধক্ষেত্রে। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাই জিজ্ঞেস করে চিঠিতে—কেমন আছি জবাব দিই—ভালই।

নয়

অগ্রগতির দূত আবার হাত ইসারায় ডাক দিল—আগে চল। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকবার জো নেই। ডেরা ডাণ্ডা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। এবার আমরা তিনজন দলের আগেই রওনা হলাম। অশ্বতর বাহিনীর (Mole Convoy) পিছনে চলার অনেক অসুবিধা রয়েছে, প্রথমতঃ জানোয়ারের ক্ষুরে ও মানুষের সবুট পদক্ষেপে যে পরিমাণ ধূলির ঝড় ওঠে তাতে করে এক অবর্ণনীয় অবস্থা হয়। দ্বিতীয়তঃ পার্ব্বত্যপথে চলতে ক্লান্তিতে দেহ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে এবং ক্রমেই দলচ্যুত হয়ে পিছিয়ে পড়তে হয়। বড় মানচিত্র সঙ্গে না থাকলে, রাস্তা ভুল করে শত্রুশিবিরে অতিথি হবার সম্ভাবনাও থাকে। সামনে থাকলে আরো সুবিধা—এই

যে পেছন থেকে ভারবাহী পশুর দল সামনের সকলকে ক্রমাগত ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলে। সর্ব্বশেষে ভাবলাম, আগে রওনা দিয়ে গন্তব্য স্থানে আগে পৌঁছে বেশ একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে। 'সেই পার্ব্বত্য পথ, তুইদিকে তুই সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালা সমান্তরালরূপে অবস্থিত। কোল ঘেঁসে সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ। মাঝখানে ঢালু জলাভূমির ন্যায় উপত্যকা। পথ চলেছে ছোট ছোট পাহাড়ের টীলা বেয়ে নালার বুক ঘেঁসে সেই সীমাহীন জঙ্গল আর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আরামে এগিয়ে চলেছি, রৌদ্রের তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এক ঘণ্টা চলার পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম। পিঠেব বোঝা মাটিতে নামিয়ে অনেকটা হাল্কা বোধ করমাম, জলের বোতল খুলে সামান্য জল নিয়ে শুষ্ক তালু ও কণ্ঠ ভিজিয়ে নিলাম। কারণ পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব, পথে আবার কবে কখন পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারব তার কোনই নিশ্চয়তা নাই। কাজেই আকণ্ঠ পান করে পিপাসা মেটাবার সৎসাহস না করাই ভাল। তাছাড়া খালি পেটে জল খেয়ে অনেক দূর পথ চলতে গেলেই পেট ব্যথা অনিবার্য্য। অনেক সময় নালার ঐ খোলা কর্দ্দমাক্ত জলকেই পানীয় জলে পরিণত করে নিতে হয়। সেজন্য অবশ্য ক্ষুদ্র এক টিনের কৌটায় শিশির ভেতর তু'রকম ট্যাবলেট, থাকে 'বীজাণু নষ্ট করে জল বিশুদ্ধ করবার জন্য'—বিশুদ্ধ হতে কম পক্ষে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। এইবার গা-ঝাড়া দিয়ে

শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে পথচারীর পথ চলা আবার সুরু হয়। অনেকটা রাস্তা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখি আমাদের দলের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় সবই শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। অনেক সময় পাহাড়ী পথ চলতে ওঠা নামার ঝাঁকুনিতে অশ্বতরের পিঠ থেকে বোঝা আলগা হয়ে পড়ে তখন আবার তাকে খুলে নতুন করে বেঁধে নিতে হয়। আবার কখনো আনকরা স্বল্প শিক্ষিত (Untrained) অশ্বতর তার আষ্টে-পৃষ্ঠে বোঝা বাঁধায় ঘোর আপত্তি জানায়, ঘন ঘন লাফ্ ঝাঁপ্ মেরে পিঠের বোঝা স্থানচ্যুত করে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়। সেই অবস্থায় ফেলে দেওয়া বোঝা পিঠে চাপিয়ে আবার সহজে তাকে কাবু করা মুস্কিল; এই সব কারণে দেরী হচ্ছে ভেবে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। চার পাঁচ মাইল চলবার পর দেখি এক কুল গাছ, সুপক্ক ফলের ভারে অবনত, তলা পর্য্যন্ত ছেয়ে রয়েছে। পরমানন্দে লোহার টুপির খোল ভর্ত্তি করে কুল খেতে চললাম। জীবনে কুলের স্বাদ আর এরকম উপাদেয় লাগেনি। মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা, কুল চুরির নানারকম দুষ্টুমিভরা অভিযান। এখানে কোন পাহারা নেই, বাধা-বন্ধন, বিধি নিষেধ নেই। প্রকৃতি অকাতরে দু'হাতে বিলিয়ে রেখেছেন কিন্তু গ্রহণকারীদের অভাব।

হঠাৎ স্তব্ধ দুপুর কামানের গম্ভীর গর্জ্জনে সচকিত হয়ে উঠল। শোঁ শোঁ শন্ শন্ শব্দে শেল আমাদের মাথার

অনেক উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে আকাশপথে ছুটে চলতে লাগল। অদূরস্থিত পর্ব্বতমালার গায়ে পড়েই সশব্দে শত খণ্ডে ফেটে পড়তে সুরু করল। ভীষণ সে শব্দ জী আরর্ আর্র্ বং বং। তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলাম। লক্ষ্য করে দেখি শেলগুলি আসছে, সমতল ভূমির ওপারের পর্ব্বতশ্রেণীর আড়াল থেকে। তার কোল ঘেঁসেও এমনি এক পার্ব্বত্য পথ, থমকে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ভাবছি সামনে এগুবো কিনা? এগিয়ে চললাম, সন্তর্পণে চোখ, কাণ সজাগ রেখে। শেলের পরিমাণ ও শব্দ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অনুমান করলাম এগুলি আমাদেরই কামান, অদূরে শত্রুব্যূহের উপর গোলা বর্ষণ করছে।

সন্দেহ জাগল তবে কি আমরা ভুল করে জাপানী সীমানার সন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গলী পথ বেয়ে চলেছি? সন্দেহ ভঞ্জন হল। সন্নিকটস্থ পাহাড়ের অন্তরাল থেকে গর্জ্জে উঠল জাপানী মর্টারের গোলার পাল্টা জবাব। পরক্ষণেই মেশিনগানের দূরবর্ত্তী আওয়াজ ডরট্ ডর্র্ ডরর্ ডট্। এবার নিঃসন্দেহ হলাম, এ সেই চির-পরিচিত শত্রুর সাদর আহ্বান। শঙ্কাকুলচিত্তে এবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম এক টিবির আড়ালে গাছের নীচে। এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখি উপত্যকার উপর দু'একটি মৃত অশ্বতর; রাশীকৃত ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত হাত-বোমা এবং মর্টারের গোলার বাক্স, স্তূপীকৃত শেলের খোলস ইতঃস্তত ছড়ান পড়ে রয়েছে। কোথাও পরিত্যক্ত

জীর্ণ বুট, বুলেটে ছিদ্র লোহার টুপি, বুঝতে বাকী রইল না যে, আমরা দিক ভুল করে একখণ্ড যুদ্ধ এলাকার মধ্যে এসে পড়েছি। এইবার একটি শেল বিস্ফোরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ'তিনেক গজ দূরে জন পনরো জাপানী সৈন্য পাহাড়ের গা-বেয়ে দ্রুতগতিতে সমতল ভূমিতে নেমে এল। তারা নেমে এসেই এদিক-ওদিক কি লক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। মনে হল যেন আমাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। আমরাও তৎক্ষণাৎ "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতির অনুসরণ করে দ্রুতগতিতে পশ্চাদ-পসরণে (About turn and double quick march) প্রবৃত্ত হলাম। আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।

কিছু দূরেই একটা "বুল ডোজার" (Bull Dozer) অকেজো অবস্থায় পড়েছিল। তারই আড়ালে কোমর থেকে রিভলবার খুলে গা ঢাকা দিলাম। পকেট থেকে রেডক্রশ চিহ্নিত ব্যাজ বাম হাতে ভাল করে বেঁধে দিলাম। জাপানী সৈন্যরা সমতল ভূমির মধ্যস্থিত ছোট এক টিলা লক্ষ্য করে সবেগে ধাবিত হল। আমরাও আরো দ্রুত পশ্চাদপসরণে ধাবিত হলাম। হৃৎপিণ্ড দ্রুতগতিতে চলছে। পিঠের বোঝা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। চলার গতি ক্রমাগত বাড়িয়ে ছুটে চলেছি, হাত এবার দৃঢ় মুষ্টিতে রিভলবারে আবদ্ধ। জাপানী সৈন্যরা সেই টিলায় আশ্রয় গ্রহণ করেই সুরু করল মেশিনগানের গুলি বর্ষণ, গুলি চলছিল আমাদের মাথার উপর দিয়ে, অদূরস্থিত

আমাদের সৈন্য সীমানার উপর। আমরাও ঊর্দ্ধশ্বাসে সোজা-সুজি জলাভূমির ভিতর দিয়ে দৌড়ে অপর পারে পৌঁছলাম। খানিকটা দূরে পাহাড়ের কোল ঘেসে দু'চারটী অশ্বতরের কায়া বলে প্রতীয়মান হতে লাগল। ঝোপ-জঙ্গল ভেদ করে বন্য কাঁটায় শরীর ক্ষত বিক্ষত করে নালার বুক পেরিয়ে প্রাণপণে অগ্রসর হতে লাগলাম। কাছে যেতেই চিনলাম, এরা আমাদেরই দল।

জীবনে এর আগে আর কোন দিন এত একাগ্রতার সঙ্গে অন্য মানুষ অথবা পশুর সঙ্গ কামনা করি নাই। সেখানে এক বৃক্ষ ছায়ায় শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম। এরা আমাদেরই আসল দলের ক্ষুদ্র একটি অপভ্রংশ; কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে এসে এই গোলমালের ভিতর আটকে পড়েছে। দলের অন্য লোক কেউই সঙ্গে নেই শুধু ভারবাহী নয়টী অশ্বতর এবং তাদের তিন জন চালক (Mole Driver)। ধাতস্থ হয়ে চালকদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, আমরা প্রথম থেকেই ভুল রাস্তায় রওনা হয়েছিলাম। যে পাহাড়ের কোল ঘেসে পার্ব্বত্য পথ দিয়ে আমরা চলেছিলাম—তারই ওপারে জাপানীদের সীমানা। ঐ পর্ব্বতশ্রেণী এখনো তাদের অধিকারে। আমাদের কামানের গোলা এবং শেল—আর প্রত্যুত্তরে জাপানীদের মর্টার এবং মেশিনগানের শব্দ তখনো কাণে আসছিল।

দশ

অগ্রসর হবার উপায় নেই। মাইল খানেক পিছনে হেঁটে গিয়ে নজরে পড়ল বহু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের জটলা। ২৬শ নং ডিভিশনের কমাণ্ডার জেনারেল লোমাক্স (Lomax) পর্য্যন্ত সশরীরে বর্ত্তমান। দূরবীণ দিয়ে কি সব লক্ষ্য করছেন আর তারপরই সম্মুখস্থ মানচিত্র নিয়ে সুরু হচ্ছে উত্তেজিত আলোচনা, তাঁর চারিদিকে গুর্খা শরীর-রক্ষী সৈন্য টমি গান উদ্যত করে একটি ছোট-খাট ব্যূহ রচনা করে শিকারীর মত ওৎপেতে বসে রয়েছে। গুর্খা রক্ষী সৈন্য আমাদের পিছনে টমিগানের মুখ উঁচিয়ে জেনারেলের এক সহকারীর কাছে নিয়ে হাজির করল। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—অর্ব্বাচীন মূর্খের দল। রেডক্রশের লোক তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে কি করছ? এখান থেকে জাপনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করা হচ্ছে, এইমূহূর্ত্তে রক্ষী সৈন্যদের ব্যূহের পেছনে আশ্রয় নাও। যাও, পরে সব শুনব।"

আমাদের নিকট হতে জাপানী সেনার সাক্ষাৎকার এবং তাদের অবস্থিতি সঠিক ভাবে জানতে পেরে আমাদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, সেবারের মত মাপ হয়ে গেল। পরে অবশ্য জানতে পারলাম সেই দিন শেষরাত্রে সকলের লক্ষ্য এড়িয়ে জাপানী সেনার দুতিনটি দল ঐ রাস্তা বেয়ে নেমে এসেছিল এবং নালা পার হয়ে আমাদের সৈন্যদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য ঐদিককার পাহাড়ের গুহার ভেতর

তাদের আবাসস্থল তৈরী করেছিল। আমরা রাত্রে হুকুম পেয়ে ভোর বেলা বেরিয়ে পড়েছিলাম! আমাদের আসল দলের একটি অপভ্রংশ কিছুদুর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে রাস্তা নিরাপদ নয় জেনে ওখানেই পাহাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছিল। অশ্বতর চালক তিনজন ছাড়া সঙ্গের অন্য লোকজন পিছনে ফিরে গিয়ে খবর দেয়। কাজেই বাকী আসল দল (main party) খবর পেয়ে যাত্রা স্থগিত রেখে সেখানেই থেকে যায়।

ঘণ্টা তিনেক পর খবর পেলাম রাস্তা এখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। আগেকার আড্ডাস্থলে পৌঁছিতে হলে আরো পাঁচ ছয় মাইল পেছনে যেতে হবে। এগিয়ে নতুন গন্তব্য স্থানে পৌঁছতেও তাই। কাজে কাজেই আমরা তিনজন আর চালক তিনজন নয়টা অশ্বতর নিয়ে সামনের দিকেই অগ্রসর হলাম, গুর্খা রক্ষী সৈন্যদের রক্ষণাধীন হয়ে। এবার অবশ্য সঠিক রাস্তায় রওনা হলাম। অগ্রসর হচ্ছি শুধু ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে। কিছুদিন আগে এই সব জায়গাতেই যুদ্ধের ধ্বংসলীলার এক মহান অধ্যায় অনুষ্টিত হয়। তার ফলে হয় আমাদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ, জাপানীদের সুরু হয় পরাজয় এবং পশ্চাদপসরণের পালা। তবে সুবিধা পেলেই পাল্টা আক্রমণ কিংবা খণ্ড যুদ্ধ চালাতে বিন্দু মাত্র শৈথিল্য বা ত্রুটি প্রদর্শন করেনি।

ঘাস জঙ্গল লতাপাতা অর্দ্ধদগ্ধ, শুষ্ক। অর্দ্ধদগ্ধ শাখা

প্রশাখাহীন বৃহৎ বৃক্ষসমূহ যুদ্ধের মূক সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও বোমারু বিমানের ক্রোধাগ্নি বর্ষণের ফলে পাহাড়ের চূড়া সমতল হয়ে রয়েছে। বিবিধ দ্রব্য সম্ভার বিক্ষেপিত অবস্থায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। রং বেরংয়ের স্যুটকেশ, এটাচি কেশ, চামড়ার সুদৃশ্য হাতব্যাগ ইয়াকদান, ব্যবহার্য্য তৈজস পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, বুলেটছিদ্র লোহার টুপী, মলিন পরিত্যক্ত পরিধেয় পোষাক; ছিন্ন মশারী তখনো ট্রেঞ্চের মুখে ঝুলছে। বিবর্ণ বালিশ এবং বেড কভার, প্রিয়ার কোমল হস্তের সূচী শিল্প আঁকা বালিশের কভারে নানা রকম কাজ; প্রেম গ্রন্থি (love knot) এবং ভুলোনা আমায় (forget-me-not) লতা ও ফুল আঁকা সবই একসঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরে ধূলায় জঙ্গলে লুটোপুটি খাচ্ছে।

চারিদিকে বিক্ষেপিত মৃতদেহ সূর্য্যের তেজে জ্বলে পুড়ে রয়েছে, কোথাও আবার পচে ফুলে গলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মৃত অশ্ব এবং অশ্বতর গদি এবং জীন আঁটা অবস্থায়ই মরে পড়ে রয়েছে। আকাশে ও মাটিতে দলে দলে শকুনি গৃধিনী বিচরণ করছে, কোথাও বা শিবাদল পরমানন্দে মৃতদেহ নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে, ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র, হাত বোমার বাক্স, শেলের খোলস, কার্ত্তুজ এবং অন্যান্য সামরিক দ্রব্যসম্ভার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শত্রু হস্তে বিধ্বস্ত দু'চারটি ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী এবং অসংখ্য মোটর

লরী বুলেটে বুলেটে শতচ্ছিদ্র হয়ে ধূলোয় শেষ শয্যা নিয়েছে। সবই ধ্বংসাবশেষ, ভস্মাবশেষের অবশিষ্টাংশ।

এক জায়গায় দুটি মৃতদেহ—একটি জাপানী আর একটি ভারতীয় সৈন্য দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ অবস্থায় ট্রেঞ্চের খোলে বেয়োনেট (Bayonet) বিদ্ধ অবস্থায় শেষ শয্যায় শুয়ে আছে। দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে একটি শূন্য মর্টারের গোলার বাক্সে উঁকি মেরে দেখি একটি শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ খণ্ডে খণ্ডে কর্ত্তিত অবস্থায় রয়েছে, জাপানী তলোয়ারের তীক্ষ্ণতার নিদর্শন চিহ্নস্বরূপ। তার সেই কোটরাগত শুষ্ক বিকৃত আঁখির ভয়াবহ চাউনি মনে পড়লে প্রতি লোমকূপে আজও রোমাঞ্চ ওঠে। কোথাও অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহ; কোথাও শুষ্ক অস্থি এবং কঙ্কাল, তার শূন্য অস্থি কোটরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুরন্ত হাওয়া প্রবেশ করে এক মহা দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি করে আকাশ বাতাসকে চমকিত, ব্যথিত করে তুলছিল। এর সঙ্গে মিশে রয়েছে বন্য পশুর মৃতদেহ হস্তী, চিতা, বন্য বরাহ এবং বিরাট পাইথন (Python) সমূহ। এ যুদ্ধে এরাও অব্যহতি পায় নাই। পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বোধ হয় প্রথম এদের নির্জ্জন আবাস স্থলে মানুষের প্রথম সাক্ষাৎ মৃত্যু অভিযান। তারা হল হিংস্র বনের পশু আর হত্যাকারী আমরা সুসভ্য মানব গোষ্ঠী।

এ যেন এক মহা শ্মশান। বিকট দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে চারিদিকে শুধু স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ এবং অর্দ্ধদগ্ধ অবশিষ্টাংশ। ভস্মস্তূপ থেকে তখনো কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি আকাশ পথে

উত্থিত হয়ে ধূম্রজালে মেঘ তৈরী করে চলেছে দিগন্ত ব্যাপী। পুস্তকেই এতকাল পড়েছি পূতিগন্ধময় নরকের কল্পনাময় বর্ণনা। আজ স্বচক্ষে তাই উপলব্ধি করলাম। মিথ্যাই আমরা মনে করি নরক পৃথকভাবে পৃথিবীর নীচে পাতালে বিরাজমান। স্বর্গ এবং নরক দুইই এই মাটির পৃথিবীর বুকে পাশাপাশি বিরাজ করছে। কিন্তু সাধারণ জীবন যাত্রার সহজ উপলব্ধির বাইরে বলেই আমরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকি। অবস্থা বিপর্য্যয়ে শুধু আজ এদের সাক্ষাৎ পরিচয় পেলাম। সংহারলীলার এই ধ্বংসের কি সার্থকতা? এই মারণ যজ্ঞে যে পরিমাণ টাকা অকাতরে ব্যয় হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণবলি দিচ্ছে, এর শতাংশের একাংশও যদি মানুষের দুঃখ কষ্ট মোচনের সৎচেষ্টায় ব্যয়িত হত, তবে এই ধূলার ধরণীতে স্বর্গ সুখ রচনা করা সম্ভবপর হোত না?

মৃত্যুর এই লীলাক্ষেত্র দিয়ে জীবন্ত প্রেতের মতই আমরা চলেছি। পথে নিহত এক উচ্চপদস্থ জাপানী সামরিক কর্ম্মচারীর সমাধিস্থান নজরে পড়ল। মৃতের প্রতি শেষ সম্মান স্বরূপ একটা গাছের গুঁড়ির অগ্রভাগ মসৃণ করে তাতে জাপানী ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে, তাঁর কবরের উপর পোঁতা, তারই গোড়ায় দুটি খালি টিনের কৌটায় কয়েকটি শুষ্কপত্র আম্র পল্লবের মত সাজানো।

মাঝখানে এক নির্ব্বাপিত মৃৎ প্রদীপ মঙ্গল ঘটের প্রতীক স্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেইখানে বসে বিশ্রাম করতে চোখে

পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে একটি গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থিতি। সামনে ঐ এলাকার বৃহদাকার মানচিত্র। এক জন মানচিত্রের উপর ছড়ি বুলিয়ে বিউগল্ বাজিয়ে হুকুম দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অমনি কামান গর্জ্জে উঠছে। সেই দিন সকালে চলবার পথে এই কামানের গোলাই প্রক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল, জাপানী সীমানা লক্ষ্য করে। গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে এই নিয়ে বেশ একটুখানি হাসি ঠাট্টা হ'ল, এই ভাবে সমস্ত দিন চলবার পর তথাকথিত গন্তব্য স্থানে পৌছান গেল।

এখানে একটি ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল খুঁজে বের করলাম। কিন্তু তাঁরা যা বললেন তা শুনে চক্ষু চড়কগাছ। শুনলাম আমাদের সত্যিকার গন্তব্যস্থান আমরা চার পাঁচ মাইল দূরে এবং পথ প্রদর্শক (guide) ছাড়া পথ চিনে যাওয়া অসম্ভব। রাত্রে পথ চলাচল বন্ধ, ক্ষুৎ পিপাসায় ক্লান্ত দেহভার পদদ্বয় আর টানতে পারছিল না। তা ছাড়া অশ্বতরগুলিকে বিশ্রাম দেওয়া আরো প্রয়োজনীয়। কারণ আট ঘণ্টার জায়গায় তারা আজ সমানে একটানা বারো ঘণ্টা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।

চালকদের সঙ্গে করে সুগভীর এক নালার বুকে রাত্রির মত তাদের জায়গা করে দিলাম। আমরা সেই ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে রাত্রের মত আশ্রয় নিলাম। অপারেশন গৃহে শয্যা পাতলাম, পাহাড়ের বুকে ৮।১০ হাত গর্ত্ত খুঁড়ে। চারিদিকে মাটির দেওয়াল ঘেঁসে ইস্পাতে মোড়া হাত বোমার শক্ত

কাঠের শূন্য বালি ভরা বাক্স দিয়ে তৈরী তার দ্বিতীয় দেওয়াল। তারই আড়ালে ভূশয্যায় ক্লান্ত দেহভার বিছিয়ে দিলাম।

রাত্রি একরকম বিনিদ্রভাবেই কাটল। মৃত্যুর শ্রীক্ষেত্রে যে বীভৎসরূপ দর্শন করে এসেছি, সেদিন তারই সব ছায়ামূর্ত্তি যেন জীবন্ত কায়া ধারণ করে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নানা রকম এলোমেলো চিন্তা মনের কোণে ভীড় করে উঁকি মারতে লাগল। বারে বারে কবি অতুল প্রসাদের গানটি মনে পড়তে লাগল।

—"মিছে তোর সুখের ডালি
মিছে তোর দুখের কালি
সবই শুধু ছল ছলরে ভোলা"

সকালে উঠে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব করলাম। শরীরের সমস্ত গাঁটগুলো যেন আলগা হয়ে গিয়েছে, চলতে গেলেই খুলে পড়বে। পায়ের নীচে স্থঁচ ফোটার মত জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। বুট খুলে দেখি সেখানে দুচারটি ফোস্কা উঠেছে। এই ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স্ হাসপাতালে যেখানে আমরা এক রাত্রির জন্য অতিথি হয়েছিলাম—কিছুদিন আগে জাপানীদের দ্বারা সেখানে এক লোমহর্ষণ শোকাবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে কাহিনী যেমনি চমকপ্রদ তেমনি করুণ। ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানীরা যখন একরাত্রে অতর্কিত ভাবে তাদের প্রাথমিক আক্রমণ সাফল্যের সহিত চালায়—তখন একদল জাপানী সৈন্য এই ফিল্ড হাসপাতালটিকে ঘেরাও করে। সবাই তখন যার যার ভূগর্ভ আবাসে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। জাপানীরা এসেছিল অতি আবশ্যকীয় ঔষধপত্র এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করবার জন্য। সঙ্গে করে এনেছিল তাদের একজন জাপানী ডাক্তার।

রাত্রের কার্য্যেরত ডাক্তারটিকে তারা নজরবন্দী করে এক ফর্দ্দ দাখিল করে। জাপানী প্রহরীর জিম্মায় তাকে দুঘণ্টার মধ্যে ফর্দ্দ অনুযায়ী সেই সব ঔষধপত্র বস্তাবন্দী (Pack) করে দিতে হুকুম দেয়। কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে ডাক্তারটি বলেন যে, অন্যান্য মুল্যবান ঔষধ পত্র এবং যন্ত্রপাতির জন্য নালার অপর

পার্শ্বস্থিত মেডিকেল ষ্টোরে যেতে হবে। এই বলে নালার ভেতর দিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে সুরু করে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈন্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়েই হাসপাতালে আসে। সন্ধ্যার সময় সে সব অর্ডিনান্স ষ্টোরে (Ordnance store) জমা করে দিতে হয়। কিন্তু সন্ধ্যা'র পর আগত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র এবং কার্ত্তুজ পর দিন সকালে জমা করা হয়। কাজেই সে রাত্রের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও কার্ত্তুজ আহত সৈন্যদের সঙ্গেই হাসপাতালে থাকে।

নালার বুক দিয়ে সারবন্দী রুগীদের ভেতর দিয়ে চলবার সময় রুগীদের মধ্যেই হোক বা বাইরের থেকেই হোক হঠাৎ কেউ একটি গুলি ছোড়ে। জাপানীরা তৎক্ষণাৎ ছল-চাতুরী সন্দেহ করে ডাক্তারটিকে বন্দী করে এবং সমস্ত ফিল্ড হাসপাতালটি অধিকার করে। তারপর সুরু হয় নিষ্ঠুর হত্যালীলা। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ভূগর্ভশয্যা থেকে টেনে উঠিয়ে—জাতি নির্ব্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে, শ্বেতাঙ্গ ভারতীয় কেউই বাদ যায়নি। এমন কি আহত রুগীদের তারা সেই অসহায় অবস্থায় নিহত করে।

সর্ব্বশেষে ছয়জন ডাক্তারকে নালার বুকে বন্দী করে কড়া পাহারায় কয়েদ রাখে, তারপর সুরু হয় খুন খারাপী লুট তরাজের তাণ্ডবলীলা। দ্বিতীয় দিনে আমাদের সৈন্যদলের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হয়ে ঐ জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সরে পড়বার আগে ঐ ছয়জন বন্দীকে নালার গর্ত্তে

সারবন্দীভাবে বেঁধে এক এক করে গুলি করে মারে। ছয়জনের মধ্যে একজন ডাক্তার পুনর্জ্জীবন লাভ করে। তাকে জাপানীরা লাইনের শেষে দাঁড় করিয়ে কাণের উপর গুলি ছোঁড়ে, তখনি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, জ্ঞান লাভ করে দেখে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে সে পড়ে আছে, দেহের সব অংশে হাত বুলিয়ে, খুঁজে দেখে গুলির কোন ক্ষত চিহ্ন নেই তার শরীরে। জড়তা এবং আতঙ্কে মন তার অভিভূত অবসাদগ্রস্ত, সত্যিই কি সে বেঁচে আছে? কেমন করে বাঁচল? তার সেই সময়কার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। আসল ব্যাপার ছিল, জাপানীরা তাড়াতাড়ি সরে পড়বার মুখে তাকে যখন গুলি করে রিভলভারে কার্ত্তুজ ছিল না, ফাঁকা আওয়াজ হওয়ায় সে যাত্রা সে বেঁচে যায়। এই ডাক্তারটি বাঙ্গালী।

এই ঘটনার পর ঐ জায়গাটাকে কেন্দ্র করে আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে আত্মরক্ষাকারী যুদ্ধ চালায়। নাতি উচ্চ পাহাড়ের চূড়া গর্ত্ত করে বড় বড় কামান সাজান হয়। কামানের সংখ্যাল্পতার জন্য বিমানধ্বংসী কামানসমূহ তখন গোলন্দাজী কামান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল (ground artillery). চারিদিকে পাহাড়ের কোল ঘেসে উপত্যকার চতুস্পার্শ্বে পরিখা খনন করে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলা হয়। এরই আড়ালে এবং সীমানার ভেতর হয় সৈন্য

সমাবেশ, ব্যূহের ভিতর থাকে সিগন্যাল সরবরাহ, মেডিক্যাল বিভাগ প্রভৃতি। তিন সপ্তাহব্যাপী অবরুদ্ধ অবস্থার সময় চলে আত্মরক্ষাকারী যুদ্ধ। তারপর সদ্য আগত ট্যাঙ্ক-বাহিনীর সাহায্যে সুরু হয় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ; যার ফলে সংঘটিত হয় জাপানী সেনার পরাজয়, পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন। ইহাই সপ্তম ভারতীয় ডিভিশনের (7th Indian division) বিখ্যাত "এড্মিন্ বকস" (admin box) তৈরীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পরে অবশ্য এই ধরণেই গড়ে উঠত সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং রক্ষিত পরিক্রীমা ব্যূহ (defended perimeter); যার ভেতরে স্থান নিত হাসপাতাল।

জায়গাটির সম্পূর্ণ পরিমাণ প্রায় সময়ই ৮০০ গজের বেশী হত না, সুতরাং জেনেভার আন্তর্জাতিক রেডক্রশ নিয়মানুযায়ী রেডক্রশ পতাকা ব্যবহার করতে আমরা অধিকারী রইলাম না। বহু কাল এই ভাবে সৈন্যদের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় রেডক্রশ চিহ্ন ছাড়াই আমাদের কাজ করতে হয়েছে। সেই জন্য আমাদের শিখতেও হয়েছিল সব রকম আগ্নেয়াস্ত্র চালনা—যার ফলে ডাক্তারদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে থাকত রিভলভার, টমি গান, গ্রীনেড্ এবং স্টেন্গান। সেবাধর্ম্মীরাও পরিণত হলাম জিংঘাসাপরায়ণ যুদ্ধরত সৈনিক দলে। সেবাব্রতের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিত হলাম মারণ দীক্ষায়।

এই ব্যূহের মধ্যে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত আহতরা অবরুদ্ধ

অবস্থায় ছিল। তাদের পিছনের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার উপায় ছিল না। নিহতদের আশে পাশে নালার বুকে কোন রকমে কবর দেওয়া হত। প্রত্যহই হতাহতের সংখ্যা বেড়ে চলে। ওখানেই একই নালার বুকে গর্ত্ত খুঁড়ে তৈরী হয় তাদের সমাধিস্থল। মাটির বুকে একই সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে জীবন্ত এবং মৃত। এই বিপদের দিনে দুর্য্যোগের মধ্যেও আমাদের বিমানবহর অনবরত খাদ্যদ্রব্য, রসদ, ঔষধপত্র, এবং গোলাগুলি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। পরে অবশ্য ২৬নং ভারতীয় ডিভিশন এসে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সবাইকে উদ্ধার করে। সেই দিন নালার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, ভয়াল ছায়া সবার চোখে মুখে গভীরভাবে আঁকা রয়েছে। চারিদিকেই সমাধিস্থান। একই সঙ্গে হাসিখেলায় সুখে দুঃখে, কাজে কর্ম্মে একত্রে জীবনের দিন কাটাচ্ছি, অথচ এক নিমেষের মধ্যে মহাপ্রলয় ঘটে যায়। হঠাৎ কে কোথায় চলে গেল। জীবনের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা, বেদনা, ব্যর্থতা এক মুহূর্ত্তেই শেষ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ নিঝুমমেরে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সবচেয়ে দুঃখ হল এই ভেবে কোথায় কোন দূরদেশে এদের সব জন্মভূমি; কোথায় রইল এদের সব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন। মৃত্যুর সময় চোখের শেষ দেখা তো দূরের কথা, স্নেহের করপরশ, দুটো সান্ত্বনার বাণীও শুনতে পেল না। যুদ্ধ একদিন থামবে। কিন্তু তখন বন্যার বেগে সব কিছু ধুয়ে মুছে যাবে।

ধরণীর ছায়াশীতল ক্রোড়ে, বনানীর শ্যামল অঞ্চলের আড়ালে এরা ঘুমিয়ে থাকবে। প্রসূতি মাতা, থাকবেন একমাত্র মূক সাক্ষী, মৌন বেদনায়। বর্ষা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে কিছু কিছু বনফুল, ঝরে পড়বে তারা আপনা হতেই এদেরি আত্মার উদ্দেশ্যে। উতলা পবন এদের ব্যথভরা কাহিনীর রেশ বয়ে বেড়াবে এই আরাকানের পাহাড়ে, প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হবে গিরিগুহার কন্দরে, কন্দরে। পৃথিবীর সব কিছুই আবার সেই একই ভাবে চলবে। যা অতীত তা চিরকালই অতীত।

এই ভাবে আরো কত অমূল্য জীবন শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে যারা "জীবনের জয়গান" গেয়ে গেল তার প্রতিদানে ভবিষ্যৎকালে সত্যি সত্যিই কি বিশ্বমানবের কল্যাণ ও শান্তিসৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে? যার গেল, যে হারাল, সেই মর্মে মর্মে বুঝবে যুদ্ধের ফলাফল। শুধু সন্তপ্ত আঁখিজল ছাড়া পুত্রহারা জননীর আর কি সান্ত্বনা রইল? পতিহারা অভাগিনী পুত্রবধূর মৃত্যু করুণ হাসি দিয়ে নিজের দুঃখ ঢেকে জননীর চোখের জল মুছে দিতে হবে। জননী হয়তো অন্য পুত্রের মুখ চেয়ে আবার আশার স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলবেন কিন্তু অভাগিনী বিধবার শোক সম্বল কি এবং রইল কোথায়? এই যুদ্ধ থেকে কি সান্ত্বনা পাবে তারা?

প্রত্যহ আমরা এই মৃত্যুর কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছি, আশে পাশে লোক মরছে কিন্তু শোক করাতো দূরের

কথা তাদের কথা ভাববার দুদণ্ড অবসর কোথায় ? প্রতিনিয়ত নবাগত আহতদের আর্ত্তনাদ, তাদের সাহায্যের জন্য আমাদের ডাকছে। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে মৃত্যুর মাঝখানে থেকে থেকে জীবন মৃত্যুর ব্যবধান বোধ আমাদের তখন আর নেই বললেই চলে। তবে যখন মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে না এসে অতর্কিতে হানা দেয়, তখন আপনা থেকেই মনের ভিতর এক গভীর আলোড়ন হয়। গুরুতর রূপে আহত মরণোম্মুখ সৈন্যরা যখন করুণ কাতর কণ্ঠে হতাশার সুরে দু'হাতে আমাদের হাত জড়িয়ে ধরে বলে, ডাক্তার সাহেব আমি আর বাঁচবনা, ঘরে আমার স্ত্রী, বুড়ী মা আর ছোট একটি ছেলে আছে কিন্তু আমি আর তাদের দেখবনা" ভাষা এর পরে হয় মূক। দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা এবং ধীরে ধীরে তার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, বেদনার ভারে মনটা টন্ টন্ করে ওঠে। বারে বারেই শুধু মনে পড়ে—

"ফুটিতে পারিত গো ফুটিলনা সে
মরণে মরে গেল
মুকুলে ঝরে গেল
বুক ভরা আশা সমাধি পাশে"

আবার কখনো কেউ কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়—"ডাক্তার সাহেব, আমার হাত পা কেটে ফেলোনা, নুলো ন্যাংড়া হয়ে বাড়ী ফিরে বাকী জীবন ভিক্ষা করে নির্ব্বাহ করার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল। দোহাই তোমার ওভাবে আমাকে

বাঁচাবার চেষ্টা করোনা।" পাঁচ ছ ফিট লম্বা জোয়ান সমস্ত অপারেশন টেবিলটি জুড়ে শুয়েছে। গোলার আঘাতে দুটি পা গুঁড়িয়ে গিয়েছে অথবা বিষাক্ত গ্যাস্ গ্যাংগ্রীনে পা পচে যাচ্ছে। দুটো পাই কেটে ফেলতে হয়েছে হাঁটুর উপর থেকে। রুগীকে টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার সময় টেবিলটা হঠাৎ একদম ফাঁকা মনে হয়। বিলের নিচে বালতীতে নিক্ষেপিত পা দুটি উঁকি মেরে লিশ জানায়, তার কাতর মিনতি পূর্ণ অনুরোধ মনে পড়ে। চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে, কাজে আর সেদিন মন এগোয়না।

এদের মধ্যে কেউ আবার জ্ঞান হয়ে পা নেই দেখেই এক চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় দেখেছি, এবং জ্ঞান হবার পর থেকেই সে উন্মাদ। সে এক ভীষণ পরিস্থিতি, কিন্তু ডাক্তার আমরা, কাতর হলে আমাদের চলেনা। নীরস কঠিন কর্ত্তব্য দয়া, মায়া স্নেহ ভাবাবেগের ধার ধারেনা। কে ন করে ভুলে যাব হৃদয়টা আমাদের মানুষেরই, সাধারণ মানুষের মতই আমাদের অনুভূতি?

আবার অন্য দিকে আহত জাপানী বন্দীদের চিকিৎসা করেছি। প্রথম দৃষ্টিতে মনটা বিজাতীয় ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছে এদের উপর। মনে হত এদের জন্যই তো এত দুঃখ কষ্ট, এই মারণ যজ্ঞের ধ্বংসলীলা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হোত এদের কি দোষ; এরাও তো কিছুদিন আগে স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই বোন নিয়ে ভালবাসার স্নেহনীড়ে শান্ত নিরুপদ্রব জীবন যাপন

করেছে, এরা তো ক্রীড়নক মাত্র। হঠাৎ কি এক ঘূর্ণিবায়ু এল, সাম্রাজ্যবাদীদের ঈপ্সিত লিপ্সা এবং কামনার চক্রান্তে গড়ে উঠল মারণ যজ্ঞের সংহার লীলা যার রুদ্র দৃষ্টিতে জেগে উঠল মানুষের বুকে তার আদিম জিঘাংসা বৃত্তি। শান্ত নির্ব্বিরোধ কল্যাণকর যা কিছু গেল দগ্ধ ভস্ম হয়ে, এযেন রূপকথার মরণ কাঠি জীয়ন কাঠির জীবন্ত কাহিনী। মানুষ এতকাল পরে শুধু কি মরণ কাঠিরই ছোঁয়াচ পেল? জীয়ন কাঠি কি আলেয়ার আলোর মত চিরকাল ধরে ফাঁকি দিয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াবে? কোনদিনই কি তার সন্ধান মানুষ পাবে না?

বার

আবার সেই চিরন্তন এগিয়ে চলার পালা সুরু হল, সেই পায়ে চলার পথ। গন্তব্য স্থানের সঠিক নির্দ্দেশ অজানা থাকায় সঙ্গে দুজন গাইড পথ প্রদর্শক নিলাম, সেই আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু পার্ব্বত্য পথ। চারিদিকে ঘন ঝোপ আর গভীর জঙ্গল! মাইল খানেক এগুতেই কানে এল সেই চির পরিচিত মেশিন গানের আওয়াজ—ডংট্ ডরর্ ডরর্ ডট্ জাপানী বন্ধুদের আহ্বান। বেশ বুঝতে পারলাম অদূরস্থিত পাহাড়ের ভেতর থেকে আওয়াজের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ভেসে আসছে অথচ লক্ষ্যমত নজরে সঠিক কিছুই আসেনা এ যেন সেই "ডাক দিয়ে যায়

ইঙ্গিতে।" এই ভাবে গাইডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরে ছোট রাস্তা নিলাম।

চলেছি একটা টিলার আড়াল দিয়ে, টিলাটা ঘুরে পার হয়ে অন্য একটি পার্ব্বত্য রাস্তায় পড়ব। ঘুরে রাস্তার মুখে পড়তে না পড়তেই দেখি আমাদের যাওয়ার পথের মুখ ঢেকে উঁকি মারছে উদ্যত রাইফেল এবং টমিগানের নল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যখন দেখি এরা আমাদেরই পরিভ্রমণকারী বৃটিশ সৈন্য, জাপানীদের খোঁজে বেরিয়েছে। আমাদের গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে সে জায়গাটি মোটেই নিরাপদ নয়, তবে সশস্ত্র পাহারায় সেখানে আমাদের পৌঁছে দিতে রাজী হল। পরিভ্রমণকারী সৈন্যরা আমাদের পাশে সজাগ কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় রাইফেল বাগিয়ে, টমিগান উঁচিয়ে চলেছে দুদিককার ঝোপ জঙ্গলের ওপর সতর্ক শিকারী দৃষ্টি রেখে, আমরা সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি আর এগিয়ে চলছি।

কিছুক্ষণ পর পার্ব্বত্য পথ ছেড়ে দিয়ে একটু চওড়া মাটির রাস্তায় পড়লাম। এটাকে রাস্তার অপভ্রংশ বলাই ভাল, গাছ পালা কেটে, ঝোপ জঙ্গল সাফ করে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জীপ গাড়ীর চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র, রসদ এবং গোলাগুলি নেবার জন্য। এ রাস্তায় পায়ে চলা থেকে মোটর গাড়ীতে চড়া আরো বিপদজনক। দুপাশে জঙ্গলে ঢাকা খাড়া পাহাড়, ছোট ছোট দলে শত্রুসৈন্য তার বুকে গোপন বাসা বেঁধে রয়েছে।

মোটর গাড়ী এই পথে চললেই যে পরিমাণ ধূলির মেঘ তৈরী হয়, তাই লক্ষ্য করে নিজেরা অলক্ষ্যে থেকে জাপানীরা অতি সহজেই লক্ষ্য ভেদে সচেষ্ট হয়।

এই সময় একখানি জীপ গাড়ী এক গাদা ধূলো উড়িয়ে আমাদের অতিক্রম করে যাবার মুখে হঠাৎ আমাদের চারিদিকে মাত্র ৮।১০ হাত দূরে মেশিন গানের গুলি বৃষ্টি সুরু করল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমরা সবাই পাশের ঝোপের ভেতর ঝাঁপিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে আমি পড়লাম এক কাঁটা ঝোপের ভেতর।

শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল; তার ভেতরে প্রবেশ করে সঙ্গের চারজন রক্ষী সৈন্য নিজস্ব হাতিয়ার বাগিয়ে জায়গা বেছে ঠিক করে নিয়ে শত্রুর উদ্দেশে তাক করে বসে রইল। আমার সঙ্গের দু'জন সৈন্যের হাতিয়ার ছিল শক্তিশালী ব্রেন গান এবং হাত বোমা নিক্ষেপকারী রাইফেল (grenade discharger)। যথাযথ লক্ষ্যমত ছুঁড়তে হলে মোটামুটি সমতল ভূমিতে ত্রিকোণ পায়ার (tripod stand) উপর বসাতে পারলে ভাল হয়। ঝোপের ভেতর জায়গা নেই বলে এরা দুজন আমার পিঠটাকে সমতলভূমিতে রূপান্তরিত করে তেপায়ার উপর তাদের লক্ষ্য ঠিক করে ব্রেন গানটি বসালে। অবশ্য আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল "স্থির হয়ে থাকুন, নড়বেননা স্যার।" নড়াচড়া দূরের কথা, নিশ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত আমার

বন্ধ, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার অবস্থা। তারপর আবার বোঝার উপর শাকের আঁটি।"

ছুটি অশ্বতর মেশিন গানের শব্দ এবং গুলিতে অস্থির হয়ে তাদের শিক্ষা (training) সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। লাফ ঝাঁপ মেরে পিঠের বোঝা ফেলে দিয়ে, চালকের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে শিকল ছিড়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলের ভেতর দিশেহারা হয়ে ছুটে নিখোঁজ হয়ে গেল। আবার আচমকা অল্পক্ষণের মধ্যে সবই চুপচাপ। সেই পূর্ব্বেকার নির্জ্জনতা এবং ভীতিপ্রদ স্তব্ধতা। ধাতস্থ হয়ে বুঝতে পারলাম আমাদের পাশ দিয়ে যে জীপগাড়ী রাশিকৃত ধূলি উত্থিত করে আগে বেরিয়ে গেল তাকেই লক্ষ্য করে শত্রুর এই গুলি বৃষ্টি।

উপায়হীন অবস্থায় আবার চলতে সুরু করলাম। এবার অর্দ্ধশূন্য একটি জীপ গাড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল। জিনিষপত্র তুলে দিয়ে তার উপর চেপে বসলাম। সুরু হল আর এক অভিজ্ঞতার শাস্তি। অসমান উঁচুনীচু মাটির রাস্তা, ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে আসবার উপক্রম। মেলার মাঠে সেই নাগর দোলায় চেপে ওঠানামার মত প্রবল ঝাঁকুনির ধাক্কায় সীট থেকে উপরের ছাদে ঠোক্কর খাচ্ছি, আবার পরক্ষণেই উল্টো ঝাঁকিতে সবেগে সীটের উপর ঝুপ করে বসে পড়ছি। কখনো দাঁড়িয়ে শূন্যে ঝুলে পা ছুটো উপরে উঠিয়ে ঝাঁকির হাত

থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছি। ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি এই অবস্থা।

দ্বিপ্রহরে রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম, মোটর চলার রাস্তা এখানেই শেষ। সামনে এক শুষ্ক সুগভীর খাদ—তার উপর অস্থায়ী সেতু তৈরী আর সঙ্গে ওপারের জঙ্গল পরিষ্কার হচ্ছে। রাস্তা এবং পুল তৈরীর কাজ করে খনন ও সংস্কারক বিভাগীয় সৈন্যদল। (Sappers and miners)। এখানে বৃক্ষছায়ায় বসে পড়লাম। "কিমাশ্চর্য্য অতঃপরম্"। আমাদের মেজর সাহেব নেমে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে ঘণ্টা-খানেক বাদে ফিরলেন, খবর পেলেন অগ্রগামী ব্রিগেড দপ্তর থেকে, নতুন এই জীপ রোড তৈরী হচ্ছে "বুথিডং" যাবার জন্য। এ জায়গাটি শত্রু এলাকার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান, এর পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল থাকা বিপজ্জনক। কাজে কাজেই ফিরে কেঁচে গণ্ডুষ সুরু হল। সেই চার পাঁচ মাইল আবার ফিরে যেতে হবে। বলিহারী বন্দোবস্ত এবং ব্যবস্থা।

এবার নতুন জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য ব্রীগেড্ দপ্তর থেকে ছখানা জীপ্‌গাড়ী পেলাম। এখন পর্য্যন্ত আমরা আসল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরকী পাক খাচ্ছি, যোগাযোগ আর হচ্ছে না। আবার ফিরে চললাম আনুমানিক আস্তানার উদ্দেশ্যে। কিছুদূর চলার পর আমার গাড়ী আগের গাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আমাদের

তিনজনের মধ্যে সাহেব দুইজন ছিলেন আগের গাড়ীতে, আমি ছিলাম পিছনের গাড়ীতে একা। আবার সেই বিষম চরকী পাক, ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রাণ অস্থির, অথচ ঘুরে ঘুরে না পাই দলের আস্তানার খোঁজ, না পাই বিশ্রামের জায়গার ঠিকানা। এবার সামরিক পুলিশ দপ্তরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দুই সমান্তরাল পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী অপরিসর কিন্তু সুগভীর নদীর শুষ্ক বুকে এসে নামলাম। এখানেই আমাদের আসল দলের (Main Dressing Station) দ্বিপ্রহরের আগে পৌঁছানর কথা।

কোথায়? কোন চিহ্ন নেই, চারিদিক শূন্য শুধু খাঁ করছে। এক গাছের তলায় গাড়ীটা রেখে আশ্রয় নিলাম একঘণ্টা দু'ঘণ্টা কেটে গেল, কারো কোন খোঁজ খবর নেই বিরক্ত এবং অতিষ্ঠ হয়ে সেই নদীর বুকে নেমে পড়লাম।

নদীর বুকে এই জায়গাটিতে জাপানীদের এক প্রধান ঘাঁটি (Bunker) ছিল। অথচ উপর থেকে বি কিছুই নজরে পড়েনা। ধীরে ধীরে সেই পাতালপুরীর গহ্বরে প্রবেশ করলাম। অদ্ভুত এই পাতাল পুরী—আশ্চর্য্য তার পরিকল্পনা। ভিতরকার ব্যূহরচনা প্রণালী সত্যই বিস্ময়কর। ভূগর্ভের ঠিক মধ্যস্থলে বিরাট এক ৮।১০ হাত গভীর কেন্দ্রীয় গহ্বর। সমস্ত পুরীটার বাহিরে চারিদিকে দুহাত গভীর পরিখা খনন করা। নদীর বুকে এই পরিখা বেয়ে সৈন্য চলাচল সহজে দৃষ্টি গোচর হওয়া অসম্ভব। ঘন জঙ্গলের

ভিতর অবস্থিত সেই কেন্দ্রীয় গহ্বরের সবদিকটাই বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘিরে হাতী ধরার খেদার মত তৈরী। ছাদও এই ভাবে মজবুত করে তৈরী, তার উপর মাটি দিয়ে ঘাস, জঙ্গল এবং বুনোলতা জমান—হঠাৎ তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে মনেই হয়না যে, নীচে এই সব ব্যাপার রয়েছে।

এক পাশে অনেকটা দূরে সুড়ঙ্গের মুখে একটি প্রবেশ-দ্বার অতি সংগোপনে স্থিত, প্রবেশ দ্বার গহ্বরের মাটির দেওয়ালের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু তার উপরকার মাটির ছাদের ভিতর বিশেষ ভাবে তৈরী এক সুড়ঙ্গের মত মুখ, যা দিয়ে বেরিয়ে থাকে এক মর্টারগান। এছাড়া মাটির নীচে বহু শাখা প্রশাখাধারী পরিখা মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রীয় গহ্বর থেকে বেরিয়ে সুড়ঙ্গের মত মাটির ভিতর দিয়েই প্রসারিত হয়ে অদূরবর্ত্তী আর এক পাহাড়ের বুকে গিয়ে শেষ হয়েছে। বোমারু বিমান দ্বারা আক্রান্ত হলে এই সব সুড়ঙ্গ দিয়ে এক পাহাড় ছেড়ে অন্য পাহাড়ের তলায় আশ্রয় নেওয়া সম্ভবপর হয়।

এ সব যে সদ্য পরিত্যক্ত তা স্পষ্ট বোঝা গেল, সব গর্ত্তেই শুকনো ঘাস, খড় এবং চট দিয়ে তৈরী বিছানা পড়ে রয়েছে। রান্নার জায়গায় চুলা রয়েছে, ওপরে মাটির দেওয়াল কেটে তৈরী সেলফে ভাত খাওয়ার জাপানী কাঠি। রান্না ঘরে ঢুকে মাটির সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেলাম, নীচে আর এক গর্ত্তের মধ্যে দেখি গর্ত্ত বোঝাই বিস্কুটের টীন,

জালাভর্ত্তি শুকনো ভাত এবং মাংসের গুঁড়া। কাঁটা আলু এবং পেঁয়াজ ভর্ত্তি বেতের ঝাঁপি চারিদিকে ছড়ান রয়েছে, বুঝলাম এটা ছিল জাপানীদের গুদাম ঘর। আর এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই দেখি কি একটা জিনিষ চক্ চক্ করে আছে। মাটির দেওয়ালের কাছে গিয়ে দেখি পালিশ করা ঝক্‌ঝকে কাঠের তৈরী ভাত খাওয়ার জন্য দুটি জাপানী কাঠি। হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধান, নিদর্শন চিহ্ন স্বরূপ ও দুটিকে পকেটে পূরে ফেললাম।

এবার অন্য এক পরিখা ধরে মাটির নীচে চলেছি। চারিদিকেই পরিখা, থাকবার গর্ত্ত আর পরিত্যক্ত রসদের বোঝা, দু'চারটি জাপানী লৌহ শিরস্ত্রাণ ছড়ান রয়েছে, এই লোহার টুপী জার্ম্মান অনুকরণে তৈরী। সুদৃশ্য লোভনীয় আরো অনেক জিনিষ চোখে পড়ল কিন্তু এসবে হাত দেওয়া বিপজ্জনক বোধে দূর থেকে এদের সৌন্দর্য্যের তারিফ করেই রেহাই দিলাম। জাপানীরা এই সব সুদৃশ্য জিনিষের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য লুকিয়ে রেখে দেয়। হাতের চাপ পড়া মাত্র বিস্ফোরণ হয়। জাপানী এই ভাবে অনেক রকম "বুবিট্র্যাপ" (Booby Trap) পরিত্যক্ত আবাস স্থলে ফেলে রেখে যায়। অক্টো-পাসের অষ্ট বাহুর মত এই পাতাল পুরীর পরিখা এঁকে বেঁকে লতিয়ে জড়িয়ে পড়ে আছে মাটির বুকে।

এই রকম একটা পরিখার শেষ দেখবার জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত

এগিয়ে চললাম। অদূরে আর এক পাহাড়ের তলদেশের কাছে পৌঁছুতেই ভীষণ দুর্গন্ধে দম আটকে আসতে লাগল। পরিখার শেষপ্রান্তে প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত খুঁড়ে এক সঙ্গে বহু নিহত জাপানী সৈন্যকে কবর দেওয়া রয়েছে। কোন প্রকারে শুধু মাটি চাপা গোছের করে দেওয়া সেই কবর ভেদ করে বেরিয়ে রয়েছে কারো দেহের বিকৃত অংশবিশেষ, শিয়াল শকুণে ছিঁড়ে খেয়েছে। বীভৎস সে দৃশ্যে শিউরে উঠলাম। আর এগোতে সাহস হল না, আমার চারিদিকে অশরীরী সব আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলাম।

বিরাট আতঙ্কজনক নিস্তব্ধতা। কত বেলা হয়েছে, কতক্ষণ এই ভূগর্ভে মোহাবিষ্টের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিছুই জানি না। এইবার ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম, কণ্ঠ আমার শুষ্ক, বুকের ভিতর ঢিব্ ঢিব্ করছে, যদি পথ চিনে সুড়ঙ্গ বেয়ে মাটির উপর আর না উঠতে পারি? এখানেই কি আমার জীবন্ত সমাধি হবে? আমার মাথার উপরে কত লোকজন চলাফেরা করবে—অথচ স্বপ্নেও কেউ ভাববে না, যে তাদেরই একজন তাদেরই পায়ের তলায় মৃতের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল—হৃৎপিণ্ড দ্রুততালে চলতে সুরু কর্‌ল বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড়ের মত পাড় পড়তে লাগল, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম সুড়ঙ্গ বেয়ে।

মাটীর উপর উঠে দেখি সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকে অনেকটা হেলে পড়েছেন, ঘুরে আমার মাল বোঝাই গাড়ীর কাছে গিয়ে

দেখি সেখানে এক মিলিটারী পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, সেই খবর দিল আমাদের আসল দল এখানে আসতে না পেরে পথিমধ্যে আজ রাত্রের মত অন্য জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাকেও সেই জায়গায় যেতে হবে। সন্ধ্যার আগে ভাগেই সেখানে পৌঁছলাম, দুদিন পর আসল দলের সঙ্গে হারান যোগ-সূত্রের সংযোগ হল। সে কি আনন্দ, সেকি নিশ্চিন্ত খুসীর নিশ্বাস! দলের সবাই আমার দেরী দেখে বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী বন্ধু তিনজন আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল. ভাবটা যেন—"হারানিধি পাইনু বলি, হৃদয়ে লইল তুলি।"

তের

এই একরাত্রির অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ছোট একটা পাহাড়, চারিদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দিয়ে আড়াল করা এর পূবদিকে ঘেঁসে একটি নালা নীচে নেমে গিয়ে এক খাদের মধ্যে শেষ হয়েছে, সেখানে খানিকটা কর্দমাক্ত জল। এই পাহাড়টি "তানাবাসি হিল্" নামে বিখ্যাত হয়েছিল। আরাকান যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় এই পাহাড়টিই ছিল জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল তানাবাসির (Tanabasi) হেড্ কোয়ার্টাস্। যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধি এই অপরিসর নালার বুকেই অবস্থিত। এখানেও সেই দুর্গন্ধ; এ জায়গাটা তখনও মোটেই

নিরাপদ ছিল না। আশে পাশে পাহাড়ের বুকে ছত্রভঙ্গ ছোট খাট জাপানী সৈন্যদল তখনো বাসা বেঁধে রাতের অন্ধকারে মরণ প্রতিশোধ নেবার জন্য যেখানে সেখানে হানা দিয়ে বেড়াত। টিনের শুকনো আহার্য্য দিয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করে জঙ্গলের ভিতর এই নালার বুকে, এক কোণায় একটি গর্ত্ত খুঁড়ে সেই রাত্রের মত শুয়ে পড়লাম।

রাত্রি দুটোর সময় আমার ডাক পড়ল—আমার নাকি ডিউটি, অন্য একজন সহকর্ম্মী অফিসারের সঙ্গে দুঘণ্টা অফিসার লাইনে (officer's line) সজাগ সশস্ত্র পাহারা দিতে হবে। মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলাম—যা হয় একটা হয়ে যাক্; এ কাল যুদ্ধ তো শেষ হবে না, কতদিন আর এই ভাবে বন্য পশুর মত জঙ্গলে ভূগর্ভে, গিরি গুহায় বাস করব। রাত্রি শেষ হলে সকালবেলা মালপত্র বোঝাই করে সকলেই এবার এক সঙ্গে রওনা হলাম। মোটর গাড়ীর অল্পতার জন্য আমরা জন কয়েক হাঁটা পথে রওনা দিলাম। মাত্র দুই মাইল রাস্তা মোটরে চড়ে আর গায়ের ব্যথা বাড়াই কেন? এক ঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌছলাম। এ সেই পাতালপুরীর স্থান যেখানে কাল আমি একবেলা কাটিয়েছিলাম।

এখানে আর গর্ত্ত খুঁড়তে হল না। ভূগর্ভে অসংখ্য "শিয়াল গর্ত্ত" এবং পরিখা, আমাদের সকলের থাকবার স্থান এবং হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ অনায়াসে সঙ্কুলান হোল। বুট পট্টি ছেড়ে অপরাহ্নের দিকে নালার জলে স্নান করতে যাওয়ার

জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময় খবর এল এক ঘণ্টার মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। এ জায়গাটি আমাদের রক্ষিত পরিক্রীমার (Defended Perimeter) বাহিরে। নিরাপদ তো নয়ই বরং বিপজ্জনক। এই পাতালপুরীর গোপন গহ্বরে তখনো নাকি জাপানীদের গুপ্ত নৈশ বৈঠক বসে কার্য্যপ্রণালী স্থির করবার জন্য। তাছাড়া বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এরা তাদের ফেলে যাওয়া রসদের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই এ জায়গাটির উপর রাত্রে হানা দেয়। কাল রাত্রেও পাহাড়ের তলদেশ থেকে নালার বুক বেয়ে জন কয়েক জাপানী সৈন্য এসে দু'জন রক্ষী সৈন্যকে নিহত এবং কিছু ক্ষতি করে গিয়েছে।

এই বিরাট পাতালপুরীর বিস্তীর্ণ গহ্বরসমূহের কোঠরে দিনের বেলাতেও দুএক জন জাপানী সৈন্যের লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। মৃত্যুজয়ী সৈনিক এরা; জাতির জন্য, দেশের জন্য কোন রকম মৃত্যুকেই এরা গ্রাহ্য করে না। আমি কাল একা এই গহ্বরসমূহে ঘুরে বেড়িয়েছি শুনে সবাই আমাকে দুঃসাহসী (Dear Devil) বলতে লাগল। কেউ কেউ অবিশ্বাস করলে। আমি তাদের হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধান ভাত খাওয়ার কাঠি দেখালাম এবং রান্নাঘরের অংশটার ভিতরে তাদের নিয়ে গেলাম। আমাদের কর্ণেল আমায় ঠাট্টা করে বললেন, "রায়! জাপানী অফিসারটি তাঁর কাঠির খোঁজে আজ রাত্রে তোমার কাছে নিশ্চয়ই

আসবে, তুমি এখানেই থাক, নতুবা বেচারীকে না খেয়ে থাকতে হবে।"

হুকুম হল, সন্ধ্যার আগেই তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখন পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিচ্ছে। সবারই ধমনীতে দ্রুত রক্ত সঞ্চালন সুরু হল, স্নায়ু সব ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। কোথায় গেল সমস্ত দিনের ক্লান্তি জড়তা এবং অবসাদ। তড়িতাহতের মত চকিতে বুট পট্টি এঁটে সুরু হল মাল বোঝাই। সন্ধ্যার মুখোমুখি নতুন জায়গায় পৌঁছলাম, এস্থানেও বহু ট্রেঞ্চ এবং শিয়াল গর্ত্ত বর্ত্তমান। সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকার নেমে আসছে, মনে পড়ল Stand to-i. সবাই এক একটি শূন্য পরিত্যক্ত গর্ত্ত অধিকার করে বসলাম। এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে, সে রাত্রে আর হুঁস ছিল না। সকালের দিকে দেখি, আমরা অপরিসর অন্ধকার গর্ত্তে হাঁটু ভেঙ্গে সারারাত শুয়েছিলাম, নিমতলা ঘাটে গরীবদের জন্য হাঁটু ভাঙ্গা অর্দ্ধচিতাশয্যার মতন।

চারিদিকে অন্ধকার। এক কোণ দিয়ে সূর্য্যের আলো উঁকি মারছে। গুঁড়ি মেরে, হাত দিয়ে অনুভব করে, ধাপে ধাপে মাটির সিঁড়ি বেয়ে, সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে মাথা বের করে দেহটাকে নিষ্ক্রান্ত করলাম। আশ্চর্য্য হলাম, কেমন করে কাল রাত্রে এই অন্ধকার ভূগর্ভে ঝুপ করে নেমে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম। কোন রকম অঙ্গহানি যে হয়নি এইটেই সৌভাগ্য, দিনের আলোয় উপরে উঠে আসতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল অদূরস্থিত

তিনটি সমাধিস্থল, কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রুশে নাম লেখা। ভোর বেলাই মনটা খারাপ হয়ে গেল, চারিদিকে শুধু মৃত্যুর নিষ্ঠুর লীলা আর সমাধিস্থল,মনটা নিস্ফল বিফলতায় ভরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করলাম—"এবার ফিরাও মোরে।"

চৌদ্দ

এবার অধুনা বিখ্যাত "নকিডক্ গিরিবর্ত্মের" (Ngekydak Pass) বড় রাস্তার ধারে আমাদের আবাসস্থল ঠিক হোল। "মায়ূ" পর্ব্বতমালা ভেদ করে এই গিরিবর্ত্ম পূব থেকে পাশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ছোট পাহাড়, নীচে দিয়ে প্রবাহিত ক্ষুদ্র এক নদী। প্রায় সবটাই শুষ্ক বালুচর, শুধু এক প্রান্ত দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত কোন রকমে নিজের স্বত্বা বজায় রেখে চলেছে। আশে পাশে অসংখ্য সমাধিস্থল, এই সব পাহাড়ের গা ঘেঁসে, নালার বুকে, ঝোপে, জঙ্গলের ছায়ায় ছায়ায়, খানায় ডোবায় "শিয়ালগর্ত্ত" তৈরী হল, আমাদের থাকবার জন্য অদূরস্থিত জঙ্গল থেকে বাঁশ এবং কাঠের খুঁটি কেটে এনে বুনোলতা দিয়ে দড়ির কাজ করে হাসপাতাল গৃহের কাঠাম তৈরী হল। লম্বা হাতী ঘাস (Elephant Grass) দিয়ে তৈরী হল বেড়া এবং ছাদ। এই ঘাস হোগলা বনের মত লম্বা এবং এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, এর

মধ্যে অনায়াসে হাতী লুকিয়ে থাকতে পারে। অস্ত্রোপচার গৃহ মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে তৈরী হল।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, অতীব রুক্ষ, শ্রীহীন এবং মলিন। বড় বড় বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা সব জ্বলে পুড়ে গিয়েছে। পাহাড়ের শিখর দেশ, কামানের গোলায় শেলের আঘাতে আর বোমার দাপটে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গিয়েছে। এসব তো পাহাড় নয় এক একটি গোপন দৈত্যপুরী। এদের চূড়ায় মৃত্যুর অগ্রদূতের প্রতীকস্বরূপ ভারী কামান সব গোপনভাবে সজ্জিত রয়েছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যুর অনল শিখা উদ্গীরণ করবার জন্য এদের দেহের গহ্বরে সব নররূপী দৈত্যেরা সংগোপনে বাসা বেঁধেছে। সঙ্কেতমাত্র নিঃশব্দে বিবিধ মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিল্ পিল্ করে বের হয়ে দানবীয় হত্যাকাণ্ড সমাধা করে আবার এই গহ্বর সমূহে প্রবেশ করে আশ্রয় নেবার জন্য। অসংখ্য মানুষের আশা-আকাঙ্খা হতাশা এবং ব্যর্থ অভিশাপ এদেরই আশ্রয়ে বাসা বেঁধেছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এখানেও সেই চিরপরিচিত আদি এবং অকৃত্রিম ব্যবস্থা। সেই কামানের গর্জ্জন, শেলের বিস্ফোরণ, টমি গানের খটাখট আর রাইফেলের শোঁ শাট্‌ আওয়াজ। সেই ভূগর্ভে ভূশয্যায় শয়ন ; নিশুতি রাতের সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ; শত্রু সৈন্যের সেই অতর্কিত আক্রমণাশঙ্কা, সশঙ্ক, সশস্ত্র অবস্থায় দুঃস্বপ্নে ভরা উৎকণ্ঠাময় রাত্রি যাপন। আহতদের সেই আর্ত্তনাদ আর মৃতের করুণ কাতর শেষ

মরণ দৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম এই দেখে যে, এখানে এসে বাসা বাঁধবার পর এবং আরো দুমাস পর্য্যন্ত জাপানী বিমান পাখীর দর্শন একেবারেই মেলেনি। হঠাৎ যে তারা সব কোথায় উধাও হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল কিছুই বোঝা গেলনা। তিনমাসব্যাপী যাযাবর জীবনে এই প্রথম বৃহৎ পরিবর্ত্তন। বিমানের বোমা বর্ষণের চেয়ে বিমান থেকে মেশিন গানের গুলি বৃষ্টিই ছিল ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম যেদিন পাকাপাকিভাবে জানলাম, বর্ষা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। তবু যা হোক মন্দের ভাল। ভবঘুরে জীবনটা স্বল্প দিনের জন্য স্থায়ী আড্ডা পেল। সদা চলমান জীবনে হঠাৎ এই গতির মন্থরতা, ক্ষণস্থায়ী স্থিরতা শাপে বর বলেই মনে হল। এ জায়গাটার আবহাওয়া অদ্ভুত; দিনে অসহ্য গরম, সঙ্গে চলেছে প্রচণ্ড ধূলি উৎসব। গরমে সর্ব্বাঙ্গ শুকিয়ে শুষে নিচ্ছে, ধূলির ফাগুয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দিনের বেলাটা খালি গায়ে কাজ করতাম। অবশ্য লম্বা রঙ্গীন পাতলুন এবং বুট পট্টি সব সময়ই পরিধানে থাকত, নতুবা জঙ্গলা জোঁক পা বেয়ে শরীরে উঠত। হাফ্ প্যাণ্ট পরা নিষিদ্ধ ছিল। কালা আদমী আমরা, সূর্য্যের আগুনে সব বেগুণে রং, আর গোরারা ধারণ করল তামাটে রং।

সবাই মিলে তৈরী হল সে এক চৈত্র শেষের সং। রাত্রে মাটির কোটরে তেমনি প্রচণ্ড শীত। এক কম্বলে রাত্রে হি হি

করে কাঁপতে হয়। দাঁতে দাঁত লেগে যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও শেষ রাত্রে কম্বল গায়ে দিতে হত।

এখানকার মেঘাড়ম্বর অতি রমণীয়। সীমাহীন, দিগন্তে বিলীন পাহাড়ের শিখরদেশসমূহ সব সময়ই বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত রাশীকৃত সঞ্চারমান মেঘ সম্ভারে আবৃত।

নানা রংএ রঙ্গীন ঘোমটা দিয়ে পাহাড়ের চূড়ার মুখ যেন অনবরত ঢেকে রয়েছে। কখনো ধূসর, কখনো সাদা কখনো কালো কখনো আবার গভীর নীল রংএ। বেশীর ভাগ সময়ই পাহাড়ের চূড়াগুলি একটানা ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে মসীলিপ্ত হয়ে থাকে, দিগন্তের কোলে কোলে যেন "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।" রং বেরংয়ের হালকা মেঘ আকাশময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে; আবার, পাহাড়ের গায়ে ঠেকে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। পর্ব্বতগুলি যেন এক একটি অসহায় বিরাটকায় "কিং কং" তার অন্তরে বন্দী স্তূপীকৃত অশ্রুজল এবং সঞ্চিত হতাশ্বাস। তার বুকের উপর অনুষ্ঠিত এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ মেঘের আকারে হতভাগ্যদের জমাট বাঁধা অশ্রুজল তার বুক থেকে বের করে ক্রমাগত শিখর দেশে ঠেলে দিচ্ছে।

এখানে জীবনে এই প্রথম কয়েকজন বাঙ্গালী একসঙ্গে জড় হলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে সহকর্ম্মীরূপে, যদিও সাহেবী ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার রক্ষা করতে সকলের সামনে বাংলা ভাষায় কথা বলা অভদ্রতা, তবুও আমাদের নিজস্ব বৈঠকে বাংলা ভাষায় সুখ

দুঃখের কথা বলে স্বর্গসুখ অনুভব করতাম, কি সে আনন্দময় পরিতৃপ্তি!

আমাদের দলে ছিলাম ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের দুইজন; সার্জ্জারী থেকে আমি আর বাইরের পল্টনের ডাক্তারদের মধ্যে তিনজন এসে হ'ত আমাদের নিত্য সঙ্গী। এই সুদূর আরাকানে শুষ্ক শূন্য ভূগর্ভে আমাদের গর্ত্তে অর্থাৎ ভূগর্ভ প্রাসাদে হাসি ঠাট্টা গল্প কৌতুকের ভিতর দিয়ে দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেকটা লাঘব হত। প্রায়ই মিলন আনন্দের হাট বসে যেত, সভ্যতার খেঁচাখেঁচি এবং চাকচিক্যের বাইরে জনকোলাহল থেকে দূরে সুখের নীড়টা ভালই বেঁধে-ছিলাম।

যুদ্ধশেষে আজ গৃহে ফিরে এসেছি। কে কোথায় আছে, কেমন আছে জানিনা। তবুও আরাকানের "হাসি উজল কান্না সজল সুখের দুঃখের দিনগুলি" স্মৃতির মণি কোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ঐ রকম অকৃত্রিম সৌহৃদ্য, সৌভ্রাত্র, উৎসাহপূর্ণ প্রাণ খোলা বন্ধুত্ব সত্যিই দুর্লভ এবং জীবনে হয়তো আর কোনদিন সে জিনিষ পাবনা।

আমরা ছিলাম তিনজন, পরিতোষ রায়, উমা মুখার্জ্জী, আর আমি। পরিতোষ রায় "কানুদা" বলেই সাধারণে পরিচিত এবং আমাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। যদিও বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। কারণ হচ্ছে প্রথম যৌবনে তার মানসী প্রিয়া ঐ প্রিয় নামেই তাঁকে সম্বোধন করতেন।

যদিও এখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে পুরানো প্রেমে ঘুণ ধরে গিয়েছে তবুও ঐ নাম, ঐ ডাক অতীতের মধুর স্মৃতির রেশ টেনে এখনো ঝঙ্কার তোলে তাঁর মন বীণায়। কিন্তু ছিন্ন তারে মূর্চ্ছনা বাজে কি না তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। কানুদা'র মনের আঙ্গিনা অন্ধকার করে দিয়ে প্রিয়া তাঁর তুলসী মঞ্চে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে এখন অন্য গৃহ প্রাঙ্গণের অন্ধকার দূর করে গৃহশ্রী ফুটিয়ে তুলছেন, আর বেচারী কানুদা আমাদের স্মৃতির ব্যথার ভারে আজও কাতরাচ্ছিল। অন্য সময় আপন ভোলা সাদাসিধে মানুষ।

উমা মুখুয্যের জীবনেও বাল্য প্রণয়ের অভিশাপ বাদ পড়েনি। তবে সে পুরাণো। সেই স্মৃতিকে আমোল দিতে চায় না। প্রেমের অস্থিরতা, ক্ষণ-ভঙ্গুরতা এবং অসারতা প্রমাণ করতে সব সময়ই উৎসাহী। কিন্তু "তবু যেন কোথায় আজি একটি ব্যথা ওঠে বাজি।" হায়রে অভাগা বঞ্চিতের দল। মুখুয্যের স্ত্রীসুলভ গুণাবলী, আমাদের পক্ষে খুব লাভজনক হয়েছিল। কোথা থেকে কাঁচা আম জোগাড় করে, কুল কুড়িয়ে এনে লঙ্কা, তেল এবং মশলা দিয়ে নানা রকম আচার তৈরী করে শিশি ভর্ত্তি করে রাখত। আমরাও মহানন্দে রসনা পরিতৃপ্ত করতাম। সবার প্রতি তার সহানুভূতি মমতা এবং দরদ ছিল অসাধারণ। এক কথায় উমা মুখুয্যেকে সবাই আমরা ভালবাসতাম। আমরা তিনজনই অবিবাহিত সুতরাং "উন্মাদ ব্রহ্মচারীর দল" বলে অভিহিত হতাম। বাহির থেকে

আসত জাঠ্ বাহিনীর ডাক্তার সুসাহিত্যিক নীহার গুপ্ত। তার হাস্য ব্যঙ্গ কৌতুকময় কবিতা ও গল্পগুলি আমাদের নীরস জীবনকে সরস করে রাখত। নীহার গুপ্তের একটি কথার ধারা আমার খুবই ভাল লাগত। সে হচ্ছে বাংলা ভাষায় সত্যিকার যুদ্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা। বাঙ্গালী জীবনের যুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ খুবই কম। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে সত্যিকার নিজস্ব বা অনুবাদ-সাহিত্য বিশেষ কিছুই নেই। এই মহাযুদ্ধের আলোড়ন সবাইকে অনেকটা যুদ্ধসজাগ করেছে। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বই লিখে যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলবার মহানতার উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা সফল হোক।

বৎসরখানেক পরে আবার যে রেঙ্গুণ সহরে নীহার গুপ্তের সঙ্গে একই হাসপাতালে মিলিত হবো এ ভরসা কোন দিনই ছিলনা। বন্ধুভাগ্যে সতিই আমি ভাগ্যবান। তারপর ফিল্ড, পার্ক কোম্পানীর ডাক্তার নলিনী চৌধুরী, প্রথম প্রেমের সফল স্বপ্নে বেচারী সদাই ভরপূর। এ পৃথিবীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে প্রেমের স্বপ্নমঞ্জিল গড়তেই ব্যস্ত। বিরহিনী প্রিয়ার বিরহ কাতর "সজল করুণা মাখা, মিনতি বেদনা আঁকা নীরবে চাহিয়া থাকা" বিদায় ক্ষণের সে চাহনী সর্ব্বদাই তাকে পিছনে ডাকছে। নাফ্ নদীর দ্বারা বিভক্ত আরাকান "দুই তীরে দাঁড়ায়ে দুজন নিরন্তর ফেলে দীর্ঘশ্বাস।" কে জানে কোন যুগে ঘুচিবে বিরহ, আমরা অবশ্য গান গেয়ে তাকে ভরসা

দিতাম "নাহি ভয় হবে জয় বেদনার হবে অবসান।"—সুদিনে প্রেমের সৌধ নির্ম্মান তাদের সফল হোক্।

সীমান্ত বাহিনীর ডাক্তার ঠাকুর নেহাৎ নিরীহ গোবেচারী, ঘরের গৃহিণীর কল্যাণ কামণা এবং শুভেচ্ছা একে রক্ষাকবচের ন্যায় সব সময়ে ঘিরে রেখেছে। যুদ্ধ শেষে শান্ত গৃহকোণে সংসার ধর্ম্ম পালনের জন্য মনটা তার সর্ব্বদাই উন্মুখ হয়ে আছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এসে দেখা দিত শিখ বাহিনীর ডাক্তার পৃথ্বীশ চৌধুরী। সদা হাস্য মুখ, বেশ চট করে আপনার করে নেয়। বিদেশীদের মধ্যে একটি মানুষ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছেন। তিনি হচ্ছেন মেজর ডেভিস্, জাতিতে আইরিশ। কৃষক পরিবারের ছেলে, এ রকম কর্ত্তব্যপরায়ণ, নিঃস্বার্থ কাজপাগলা লোক খুব কমই দেখা যায়। "ভারতকে কেন স্বাধীনতা দেওয়া হবে না" "অজ্ঞ ভারতবাসীকে স্বাধীন দেশের মত শিক্ষা দীক্ষা দিলে তারা ইংলণ্ডের যে কোন লোকের চেয়ে ছোট নয়" এই সব বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন অন্যান্য ইউরোপীয় অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কে আমি যোগ দিয়েছি। অদ্ভুত তার পড়াশুনা এবং জ্ঞানের পরিধি, সমস্ত জগতের ইতিহাস, দেশ বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এবং সর্ব্বদেশের বিপ্লব আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস সব তাঁর নখাগ্রে। তাঁর অকাট্য যুক্তি এবং গভীর প্রজ্ঞার সম্মুখে সবাইকে হার মানতে হ'ত। এ ছাড়া ছোট খাট ঘটনার ভেতর

দিয়ে তাঁর যে মহাপ্রাণের পরিচয় পেয়েছি—তা আমি বিস্মিত মুগ্ধ হয়েছি। মানুষের মত মানুষের সংস্পর্শে আসা ভাগ্যের কথা, অথচ সবাই তাঁকে বলত "পাগলা ডেভিস্," কেউ কেউ বা বলতো "কম্যুনিস্ট ডেভিস্।"

পনের

বর্ষার পূর্ব্বাভাষ সুরু হল। সূর্য্যদেব মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকলেন। এলোমেলো বাতাস খণ্ড খণ্ড মেঘের টুকরো গুলি আকাশের গায়ে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল, দুচার ফোঁটা বৃষ্টিও হোল। সে হোল আমাদের আর এক চিন্তার কারণ। বৃষ্টি নামলে কাঠের প্যাকিং বাক্সের উপর কম্বল বিছিয়ে বর্ষাতি (Ground sheet) এবং কম্বল মুড়ি দে... ছাড়া কোন উপায় নাই, সুতরাং পরদিন বাঁশবন ...ক বাঁশ কেটে এনে বুনোলতার সাহায্যে মাটি থেকে আধ হাত উঁচু এক মাচা সেই ভূগর্ভে তৈরী করলাম, অন্ততঃপক্ষে তল-দেশের জলস্রোতের হাত থেকে তো রক্ষা পাওয়া যাবে।

সামরিক জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে স্বকীয় সহজ সামাজিক জীবন যাত্রার অভাব। বেশীর ভাগ অফিসারই শ্বেতাঙ্গ। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এসে মিলেছে। ভারতীয়

আমরাও বিভিন্ন প্রদেশ হতে আগত। আফিসার মেসের চাল চলন, রীতি নীতি, আদব কায়দা আহার বিহার সবই পূরোদমে সাহেবী ধরণের। এই সাহেবী সামাজিক জীবনের সঙ্গে খুসীর সঙ্গে খাপ খাওয়ান সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা ভারতীয় আচার ব্যবহার, রান্নার পদ্ধতি, আহারের বিধি ব্যবস্থা সব কিছুই অবহেলার চক্ষে দেখে। সেজন্য আমরাও অনেকটা দায়ী, কর্ত্তাদের পছন্দ নয় জেনে নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য আদব কায়দা সম্বন্ধে হঠাৎ উদাসীন হয়ে পড়ি। এমন কি জাতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপর অবহেলার কটাক্ষ এবং তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত পর্য্যন্ত হই না। আমরা যেমন রাতারাতি আমাদের জাতীয় সব কিছু ভুলে সাহেবদের সব কিছু নকল করতে যাই, কই কখনো সাহেবরা ভুলেও তো আমাদের রীতিনীতি একদিনের জন্যও স্বীকার করে না। তবু কেন তাদের অনুগ্রহ পাবার জন্য আমাদের এই নগ্ন কাঙ্গালপনা ; মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য দুশ্চর তপস্যা এবং দাস সুলভ আভূমি প্রণত নম্রতা ?

তারপর অ᳐বিধা হচ্ছে—ইউরোপীয় প্রথায় সামাজিকতা বজায় রাখা, অঙ্ক কষে কথা বলা, ওজন করে হাসা এবং চলাফেরা, কথায় কথায় মৌখিক বিনয় প্রকাশ করা। কাঁটা চাম্‌চে সহযোগে নিঃশব্দে আহার এবং পান করা। কোন রকম শব্দ হলেই আবার মৌখিক ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হয়। আবশ্যক

অনাবশ্যকে "বেগ্ ইউর পার্ডন," (Beg your pardon)। ধার করা ভাষায় আহারে বিহারে আচারে ব্যবহারে সদা সর্ব্বদা তার প্রয়োগে অতিষ্ঠ লাগে। এই সব মৌখিক বিনয়, শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা বাহিরের খোলস মাত্র, গিল্টি করা জৌলুষের মত ঘষা দিলেই উঠে যায়। আন্তরিকতার লেশ মাত্র নেই, বাহিরের জৌলুষই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান মাপকাঠি, মনকে দেহ হ'তে এরা সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছেদ করেছে কিন্তু আমরা অন্তর ছাড়া দেহকে ধারণাই করতে পারি না। এই হচ্ছে এদের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য।

সামরিক জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে দিনান্তে সুরা দেবীর আরাধনা ও সেবা। কয়েক পেগ্ হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, জিন, রাম্ বা ককটেল উদরস্থ হবার পর এদের মনটা বেশ খোলে, সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া এদের চিন্তাকে বেশ তরল করে তোলে এবং নৈশ আড্ডাটি ক্রমে মশগুল হয়ে ওঠে। আনন্দের যে হুল্লোড় এখানে চলে তা মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়, সে হচ্ছে নেশার অভিব্যক্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগী নারী সঙ্গ ও সান্নিধ্যের অভাব ঘটেনা, মদ এবং সিগারেটের নেশায় যারা বঞ্চিত তাদের এই বৈঠকে স্থান নেই—দুটোর যে কোন একটা চললেই প্রবেশ পত্র সহজেই পাওয়া যায়।

তারপর সুরু হয় তাসের জুয়া খেলা, সঙ্গে চলে নানারকম মুখরোচক আলোচনা, আলোচনার কেন্দ্রীভূত বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন নৈশ ক্লাবের ব্যাপার, সিনেমা অভিনেত্রীদের গল্প ও কাহিনী।

রম্বা, ফকস্‌ট্রট্‌, ক্যাবারেট, ওয়ালটজ্‌, টগপ্‌ প্রভৃতি বিদেশী নৃত্যের বিশদ বর্ণনা, মেয়েদের নিয়ে ইতর হাস্য কৌতুক—সেটা অবশ্য মেয়েদের উপস্থিতিতে অনেকটা সংযত আকার ধারণ করে, যদিও প্রচ্ছন্ন আভাষ ও ইঙ্গিত সব সময়েই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনেক মেম সাহেবেরা আবার মদ গিলে ফাজলামি এবং ইতরামির পাল্লা দিতে সুরু করে দেয়। পুরুষরা পরস্ত্রী এমন কি গৃহে ফেলে আসা নিজেদের স্ত্রী নিয়ে লঘু ঠাট্টা এবং নানা রকম অশ্লীল আলোচনা করে। এই সবই আমাদের রুচি এবং শালীনতায় প্রচণ্ড আঘাত করে, অথচ মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া বিরক্ত হয়ে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়া ভিন্ন উপায় নেই।

ইউরোপ ইন্দ্রিয় জগতের শ্রীহীন নগ্নতাকে বরণ করেছে, প্রকৃতি প্রপঞ্চের ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে, আমাদের দেশেও ইন্দ্রিয়ালুতার অভাব নেই। কিন্তু ভারতীয় চেতনা পার্থিবকে ধরেও ইউরোপের মত একান্ত ইন্দ্রিয়সেবার মধ্যেই সকল পরিচয় নিঃশেষ করতে পারেনি। তবে দুঃখ এই আমাদের মধ্যে অধিকাংশ যুবক এই প্রকৃতি প্রপঞ্চের পূজায় মেতে উঠেছেন। কারণ এত স্পষ্টভাবে বাঁধন হারা অবস্থায় হাতের মুঠার মধ্যে বহু নারীর সান্নিধ্য জীবনে এই প্রথম। তাছাড়া শ্বেতাঙ্গ রমণীর স্বাস্থ্য, রং, জৌলুষ, অঙ্গভঙ্গিমা এবং দেহসজ্জা সৃষ্টি করে দুর্নিবার আকর্ষণ, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না যদি মানুষের বিবেচনা এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, এতটুকু সংযমের

পরিচয় যদি আমরা না দিতে পারি, তবে এই শিক্ষার মূল্য কি? ধিক, আমাদের এই মনুষ্যত্ব।

মেয়েদের পিছনে যুবকদের হ্যাংলা কাঙ্গালপনা দেখে ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মে যায় নিজেদের ওপর। পরাধীন জাতি আমরা —"যাদের পায়ে নিশিদিন শিকল বাজে" আমাদের কি শোভা পায় এই সব বিলাস, ব্যসন, উৎসব এবং ইন্দ্রিয়ালুতা? আমাদের উচিত বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে দেশকে চেনা, সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা দেশকে জানা, এবং সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তোলা। কিন্তু আমরা নিজেদের নিকৃষ্ট অধিকারী বলে স্বীকার করে নিয়ে আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে সর্ব্বভাবে আত্ম অবমাননায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছি। সর্ব্বভাবে আজ আমাদের পরাভব ঘটেছে। আমরা কেবলই মেকী দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের ভোলাচ্ছি—এবং ঠকাচ্ছি আর শূন্য গর্ভ কৈফিয়ৎ দিয়ে দেশের প্রতি কর্ত্তব্যকে দু'হাতে প্রাণপণে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখছি।

ষোল

ইউরোপে শিশুকাল হতে একসঙ্গে শিক্ষা এবং সহজ খোলাখুলিভাবে মেলামেশার মধ্যে গড়ে ওঠে নর ও নারীর সহজ সম্বন্ধ। নারীকে তারা উপভোগের বস্তু ছাড়াও পায় সহকর্ম্মীরূপে, প্রতিভা সম্পন্ন সঙ্গী, বন্ধু এবং উপদেষ্টা হিসাবে, কিন্তু আমরা নারীকে দেখি কৌতুহলের দৃষ্টি দিয়ে। এজন্য দায়ী আমাদের ত্রুটিপূর্ণ গৃহশিক্ষা, আমাদের সামাজিক সংস্কার। নব নব কালের সঙ্গে নব নব ব্যবস্থার দ্বারা সন্ধি স্থাপন না করার ফল। বাঙ্গালা দেশে ছেলেবেলা থেকেই খেলা সুরু হয় "বউ বউ," "বিয়েবাড়ী" পুতুলের বিয়ে দেওয়া, সাড়ী এবং গহনা পরান ইত্যাদি। পিসীমা দিদিমাদের মুখে গল্প শুনে ছেলেদের মনে নববধূ সম্বন্ধে গড়ে ওঠে নানারকম রঙ্গীন কল্পনা, যার ফলে মেয়েদের আমরা মনে করি একটি সুন্দর খেলনা, যাকে নিয়ে শুধু খেলা করাই চলে। উপভোগের বৃত্তি ছাড়া ছেলে মেয়েরা যে মেলা মেশা করতে পারে এ আমরা ধারণাই করতে পারি না। নারী মাত্রেই আমরা মনে করি রহস্যের পিরামিড্। বিবাহের দায়িত্ব, সমাজ, সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে গুরুজনদের কাছে থেকেই একটি কথাও তো শুনতে পাইনা। শুধু ভগবানের দোহাই, ভক্তদেশ।

অনেক সংসারে দেখি, দাদা বিবাহ করে এল অথচ দাদা বৌদি পরস্পরকে এড়িয়ে চলে সন্ত্রস্তভাবে, দিনের বেলায়

কারো সাক্ষাতে কথা বলা বন্ধ। কুতূহলী কল্পনাপ্রবণ শিশুদের মন, নতুন সব কিছুরই ওপর তাদের অদম্য কৌতূহল। উৎসুক হয়ে তারা এদের উপর লক্ষ্য রাখে, দেখে রাত্রে আহারাদির পর বৌদি চট করে দাদার ঘরে ঢোকে এবং ভোরবেলা চোরের মত সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে। শিশুচিত্তে প্রশ্ন ওঠে এদের মধ্যে কি সম্বন্ধ? কেন এরা দাদা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাতার সামনে ব'সে একসঙ্গে কথা বলেনা? কোন উত্তরই সে পায় না, কতক মন গড়া আর কতক অস্পষ্ট ভাবে শোনা কতকগুলি কথা দিয়ে সে এই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করে। অভিভাবকরা এ সম্বন্ধে ভুলেও ভাবেন না। অথচ সন্ধ্যার সময় প্রায় বাড়ীতেই পারিবারিক মজলিশ বসে—নিজস্ব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে। নব বিবাহিত দম্পতী যদি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং আর পাঁচজনের মত সহজ ভাবে কথাবার্ত্তায় যোগ দেয় এবং রাত্রে সকলের মত নিজের নিজের ঘরে শুতে যায় তা এই নতুন লোকটিকেও আপনার একজন ব'লে মনে হয়। অকারণ কৌতূহল অনেকটা কমে যায়। শিশুচিত্তের ঔৎসুক্য জাগবার কোন অবকাশ হয় না। তেমনি অন্যদিকে ছোট ভ্রাতৃ-বধূ কত আদরের স্নেহের জিনিষ ছোট বোনের মতন, অথচ সে হবে ভাদ্র বধূ, ভাশুর না বলে স্বামীর বড় ভাইকে যদি দাদা বলে ডাকে তবে সহজেই স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সম্পর্কের গরমিল, গোঁজামিল এবং বিসদৃশতা শিশুচিত্তে নরনারীর সম্পর্ক

নিয়ে কি মহা অনিষ্টকর আন্দোলন তোলে তা অনেকেই জানবার চেষ্টা করেন না।

মনে পড়ে আমার এক বন্ধুর ছোট ভ্রাতৃবধূ কূয়ার পাড়ে জল তুলতে পা পিছলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু বাড়ীতে আমার সেই বন্ধু—বড় ভাই ছাড়া অন্য কেউ বাসায় না থাকায় বধূকে কে তুলবে সেই জলসিক্ত কূয়োর পাড় থেকে? ভাদ্র বধূর শরীর ছোঁয়া যে অপরাধ। আমার ডাক পড়ায় আমি গিয়ে যথা বিহিত ব্যবস্থা করলাম। নিঃসম্পর্কীয় আমি, সে বেলা কোন আপত্তি নেই দোষ নেই; সমাজের বিধিনিষেধের কি শোচনীয় পরিণাম! শিক্ষিত সভ্য বলে আমরা গর্ব্ব করি। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান তার বাহিরের কাঠাম এবং কর্ম্মকেই আমরা আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। অন্তর ধর্ম্মকে প্রতিপদে খর্ব্ব কর্‌ছি।

প্রতিকার করার সৎসাহস এবং চেষ্টা তো আমাদের নাইই—প্রতিবাদ পর্য্যন্ত আমরা করিনা—আমাদের আপত্তি আমরা প্রকাশ করি না।

থাক "এ ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত"। তারপর আর এক প্রকাণ্ড অসুবিধা হচ্ছে—সাহেবী খানা, যারা গবাদি মাংস খান না, হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পর পর্য্যাপ্ত আহার্য্য মেলাই তাঁদের মুস্কিল, দিনের পর দিন টিনে রক্ষিত শুষ্ক আহার্য্য পাগল করে তোলে, রান্না যা হবে—হয় সিদ্ধ নয়তো ঝলসান। ঝাল নেই, মশলা নেই, শুধু একটু আলগা নূন এবং গোল মরিচ

ছড়িয়ে খাওয়া। ছুদিনে রসনা রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমাদের প্রধান উপাদেয় খাদ্য ডাল একেবারেই অজানা। ভাত ক্বচিৎ কদাচিৎ। দুঃখটা আরো বেড়ে ওঠে যখন দেখি আমাদের মধ্যে অনেকে, মনে প্রাণে, চাল চলনে, আদব কায়দায় সাহেব হবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে-পড়ে লেগে যায়। সঙ্গতি অসঙ্গতি বোধ এদের একেবারে লোপ পায়। এদের হঠাৎ সাহেবীপানা মনটাকে আরো বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ভারতীয় আমরা নিজস্ব ধর্ম্ম, বৈশিষ্ট্য, জাতীয়তা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ওপর আমাদেরই কোন বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই। বিদেশীদের দোষারোপ করলে কি হবে, বৃটিশের প্রভুত্ব আমরা অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সর্ব্ব জায়গায় সর্ব্বভাবে আমরা প্রাধান্য দিই তাদের ভাষাকে তাদের জীবন ধারা এবং ভাবপ্রবাহকে।

আমাদেরই একজন প্রবাসী বাঙ্গালী অফিসার একদিন বৈঠকী আলোচনায় উত্তেজিতভাবে মত প্রকাশ করলেন—"সুভাষ বসু জাপানীদের দলে ভিড়ে গিয়ে আমাদের অত্যন্ত ফলস্ পজিশনে (False position) ফেলেছেন, সাহেবদের সঙ্গে বৈঠকে এবং ক্লাবে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে।" শিক্ষিত যুবকের এই মনোবৃত্তির উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, এই রকমই তো হয়। কবি গুরুর কথায়—"আমরা যখন বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হই তখনই লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা বিস্তারের দ্বারা

তাকে নেবার জন্য ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছায়, তাতে রং চড়াই বেশী, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র, অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিষটা আমারই অথচ নানা দিকে তার অসারতা, ভঙ্গুরতা, তার আত্ম বিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে।" খোঁজ নিয়ে জানলাম আমাদের এই বাঙ্গালী ক্ষুদে সাহেবটার বড় সাহেব নেতাজী সুভাষ বসুর নামে তীব্র নিন্দা, গালি গালাজ ক'রে সমস্ত বাঙ্গালীর উপর কটু কটাক্ষ নিক্ষেপ করতেই আমাদের এই বাঙ্গালী সাহেবটার এই উত্তেজনা এবং বিক্ষোভ। যদি এত সাধের 'সাহেবী চাকরি'টা যায়।" হায়রে দুর্ভাগা দেশ, হায়রে অভাগা সন্তান।

ইউরোপীয়দের ভেতর কচিৎ কদাচিৎ দু'চার জন সঙ্গী পাওয়া যায় যাদের মনটা উদার; যারা ভাল মন্দ বোঝবার চেষ্টা করে। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের সম্যক পরিচয় এবং অর্থ জানতে চায়। তবে বেশীর ভাগ শ্বেতাঙ্গই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভারতবর্ষ এদের কাছে শুধু তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস ব্যসনের উপকরণ জোগান দেবার বৃহৎ একটা গুদাম মাত্র। নিজেদের দেশ, সমাজ এবং দেশবাসী ছাড়া অন্য দেশ বা দেশবাসী সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল আছে কিন্তু অনুসন্ধিৎসা নেই। দূর থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ভারতীয়দের দোষ ক্রটি নিয়ে হাসি ঠাট্টা

করতে সব সময়েই উৎসুক। বর্ণ-বৈষম্য এবং সাম্রাজ্যবাদ স্বকীয় শ্রেষ্ঠতা বোধ এদের রক্তের প্রতি কণার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে। এদের চালচলন, আচার ব্যবহার, সব কিছুতেই এরা যে সুসভ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসক শ্বেত জাতির গোষ্ঠী তার পরিচয় এবং প্রমাণ দিতে ব্যস্ত। কালা আদমী সে তো গুণতির মধ্যেই আসে না। বর্ণ-বৈষম্যের এই সাক্ষাৎ পরিচয় হাসপাতালেও পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় এবং বৃটিশ আহত সৈন্যদের মধ্যে তাদের আহার্য্য, বাসস্থান, বিশেষ পথ্যাদির ব্যবস্থায় এই বৈষম্য দৃষ্টি গোচর হয়। নোটীশ আসে—বিশেষ বলকারক পথ্য এবং খাদ্যদ্রব্যের ফর্দ্দ, এই পরিমাণে রুগীদের জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাদটীকায় লেখা শুধু বৃটিশ সৈন্যের জন্য (For British Troops only)। বিশ্ব স্বাধীনতার সংগ্রামে নিযুক্ত পরাধীন ভারতীয় সৈনিকদের এই তো প্রাপ্য।

বর্ণ-বৈষম্যের একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা না বলে থাকতে পারলাম না। যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে অনেক আহত ভারতীয় সৈনিক আসে, গোলা গুলির আঘাতে তাদের সব কয়টা আঙ্গুল বা হাত হারিয়ে। কখনো পেট্রোল বা ফস্‌ফরাস্ হতে বোমায় দগ্ধ হয়ে। এই সব রুগীদের খাইয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। হাসপাতালে বিলেত থেকে সদ্য আগত মেম নার্সরা (Sisters and V. A. D's). তাদের সেবা শুশ্রূষা, আদর যত্ন, খাইয়ে দেওয়া সব কিছুই মনপ্রাণ দিয়ে

আনন্দের সঙ্গে করত। এ বিষয়ে তাদের অযাচিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু মেম সাহেব, তারা হাত দিয়ে নিজেরাই কোন দিন আহার করে নাই, অন্যকে কি করে হাত দিয়ে খাওয়াবে। তাদের অত্যন্ত অসুবিধা হত। একদিন তারা আমায় বললে, "ক্যাপ্টেন্ রায়! দুচার খানা চামচ আনিয়ে দাও, না হলে এদের খাওয়াতে বড্ড অসুবিধা হচ্ছে। বেশী পেলেই ভাল, নতুবা চামচের অভাবে আহার্য্য সামনে রেখে বেচারীদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। এক জনের খাওয়া শেষ না হলে তো আর সে চামচ ব্যবহার করা যাবে না।" আমি চামচের জন্য কোয়ার্টার মাষ্টারের কাছে চিঠি দিলাম। জবাব এল "ভারতীয় সৈন্যরা চামচ পাওয়ার অধিকারী নয় (Not entitled)—তারা হাত দিয়ে খাবে।" রাগে দুঃখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কিন্তু উদ্যত ক্রোধ চেপে নিজেই গেলাম এই বৃটিশ পুঙ্গবের কাছে এবং বেশ কটু কণ্ঠেই বললাম—"হ্যাঁ, তুমি যা লিখেছ তা আইন অনুযায়ী খুবই ঠিক। কিন্তু তোমার প্রভুরা কখনো কি ভাবেন নি যে, ভারতীয় সৈন্যরা তোমাদেরই জন্য যুদ্ধে সবকটী আঙ্গুল এবং হাত হারিয়েও হাত দিয়ে তাদের খেতে হবে? ভাগ্য বিড়ম্বনায় তোমাদেরই স্বজাতি মেম নার্সরা আজ নিজেদের হাত দিয়ে তাদের খাওয়াচ্ছে—অন্ততঃ তাদের এই অসুবিধার কথাটা বড় কর্ত্তাদের জানিয়ে দিও।" তিনি তখনই ঠাণ্ডা হয়ে নরম সুরে বললেন—

"আমি কি করব, এই দেখ সরবরাহ বিভাগের আইনাবলী, ভারতীয় রুগীদের জন্য চামচের কোন ব্যবস্থাই নেই।" মর্ম্মাহত হয়ে ফিরে এলাম। মানুষের হাতে গড়া নিয়ম যদি মানবতার ধর্ম্ম মেনে না চলে এবং সমান ভাবে সকলের পক্ষে প্রযোজ্য না হয় তবে সেই নিয়ম শৃঙ্খলের মত যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় ততই মঙ্গল। পরে অবশ্য আমি এবং আমার ওয়ার্ডের সিষ্টার এক পার্টিতে উপরআলার সঙ্গে দরবার করতে তু'দিনের মধ্যেই চামচ যোগাড় হল। আবার কোন ক্ষেত্রে রুগীদের ময়লা বিছানার গদী বদলাতে চেয়েছি, কোয়ার্টার মাষ্টারের তরফ থেকে জবাব এসেছে—"যুদ্ধে আসার আগে ভারতীয়দের খাটে গদীতে শোবার অভ্যাসই ছিল না—খালি খাটিয়া যে পেয়েছে সেই পরম ভাগ্য।" এ সব দেখেও মোহ আমাদের কাটে না।

তারপর যা বলছিলাম—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের বদ্ধ ধারণা সহজে বদলাতে চায় না। অপ্রিয় কথা এবং কঠোর সত্য আলোচনা শুনতে এরা নারাজ। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে ইতিহাস ভূগোল এবং আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এদের সাধারণ জ্ঞান অনেক উচ্চ। সাহিত্যকে এরা সকলেই বেশ আদর করতে জানে। ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকেই চেনে না, তাও রবীন্দ্রনাথ যে নাটক, গান, গল্প এবং উপন্যাস লিখেছেন সেটা তারা জানে না। বাঙ্গালী আমরা, মা, পিসীমা এবং দিদিমার

অঞ্চলের সীমা আর নিজেদের ক্ষুদ্র গৃহকোণের গণ্ডী ছাড়া কিছুই আমরা চিনি না। চেনবার বা জানবার প্রয়োজন বোধ করি না। ভারতবর্ষ, সে তো অনেক বড়, গোটা বাংলা দেশকেই আমরা চিনি না, জানি না, কি করে বিদেশী নবাগতকে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্যক পরিচয় করিয়ে তাদের ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণা দূর করতে সমর্থ হব। আমাদের নিজেদের সঙ্গে জন্মভূমির যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। বাহিরের বিদেশীর সংগে যোগাযোগ ঘটাব কি করে? তাইতো কবি বড় দুঃখে গেয়েছিলেন "সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাংগালী ক'রে মানুষ করনি।" প্রতি পদে আমাদের প্রতি প্রভুদের অনুকম্পা, অবজ্ঞা এ একটা মুরুব্বিয়ানার চাল মনের ভেতর আগুণ জ্বেলে দেয়, মন স্বতঃই গুমরিয়া ওঠে,—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে যায়।"

অন্যদিকে আবার ভাবি, এই যুদ্ধ অবসানে আমাদের মধ্যে যারা জীবন সন্ধানী হয়ে এই যুদ্ধে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে ক'জন তাঁদের অর্জ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে জাতীয় জীবনে সফলতা এবং সার্থকতা আনবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন, প্রচেষ্ট হবেন? এমন একদল কি সত্যই গড়ে উঠবে, ছেলে মেয়ে দুইই, যাদের কাছে দেশই হবে সব। স্বজাতির উত্থান, স্বদেশের সম্মান এবং কল্যাণের কাছে যাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সব তুচ্ছ

মনে হবে! দু'দশটা জীবন না হয় যাবেই দেশের কাজে, না হয় তাদের নিজেদের জীবন সার্থক নাই হবে? সংশয় জাগে, বহু প্রলোভন পূর্ণ, বিলাস ব্যসনে ভরা, বৈচিত্র্য বহুল সামরিক জীবনের আবহাওয়ার মধ্যে অধিকাংশ যুবকই "কুটীল কুপথ ধরিয়া" বিপথে অনেক দূরে সরে পড়ছে। অনেকে আবার উল্টো পথে বিপরীত দিকে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে, এমন কি পেছনে ফেলে আসা গৃহকোণ ভুলে, অভাগিনী স্ত্রীর সন্তপ্ত আঁখিজল উপেক্ষা করে বিলিতী এবং দেশীয় খৃষ্টান দিদিমণিদের নিয়ে ক্রীড়া কৌতুক এবং নিশ্চিন্ত প্রেমের বেসাতি চালাতেই ব্যস্ত। সত্যিকারের ক্ষোভ হয়—এই বিপুল যুদ্ধ আয়োজন, এই সব মহতী বাণী মানুষকে শুধুই কি ভুল পথে চালনা করবার নব উদ্ভাবন? কেন এই দানবীয় হিংসা হত্যাকাণ্ড, তা যদি মানুষের বহু তপস্যা লব্ধ দেবত্বকে খর্ব্ব করে চূর্ণ করে? ভয় হয় ভবিষ্যতে হয়তো যুদ্ধ ফেরত দল লক্ষ্মীছাড়া, সমাজহীন এক অপরূপ পাঁচমিশেলী জগা খিচুড়ীর দল গড়ে তুলবে। সেইজন্য এই সন্দেহ, এই সংশয় মনে হয়,—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।"

সতের

আবার সাজ সাজ রব উঠল, আরাকানে গ্রীষ্ম অভিযানের পালা শেষ হোল। রণক্লান্ত সৈন্য সব পিছনে যাচ্ছে, এখন যে সব নদীনালা তাদের বুকে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, বর্ষা সমাগমের সংগে সংগেই তারা ভরে উঠবে কাণায় কাণায়। তুকূল ছেপে উঠবে তার বিপুল জলপ্লাবন। বর্ষার ভৈরব-লীলা স্বুরু হওয়ার পূর্ব্বেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নতুন করে আবার আমাদের বাসা বাঁধতে হবে, তাই চারিদিকে সাজ সাজ রব। সবারই মন অনেকটা হাল্কা, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, সদা সশঙ্ক অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে।

কিন্তু আনন্দের মধ্যে বিষাদের স্বুর বেজে উঠল,বর্ষা সমাগমে আমরা সব দলছাড়া হয়ে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, এতদিনকার বন্ধুত্বের গ্রন্থী আজ বন্ধন অস্বীকার করল। নকিডক্ গিরিবর্ত্মের পাশে এই তু'মাস ধরে যে সব সাথী সঙ্গী, বন্ধুবান্ধব, পেয়েছিলাম—তারা সবাই একে একে বিভিন্ন পথে যাত্রা স্বুরু করতে বাধ্য হল। স্বুরু হল কষ্টকর বিদায় পালা। আবার নতুন করে ঘর-সংসার গড়ে তুলবার সন্দেহ-দোলা। সবার আগে গেল নীহার গুপ্ত ছুটিতে, আর ফিরলনা আরাকানে আমাদের মধ্যে। তারপর কাকুদা, চৌধুরী, সর্দারশ্রাম মথারযা। "পরাণো আবাস" ছেড়ে যেতে বেশ কষ্ট

হল। যাও বন্ধুগণ, বিদায়। "নকিডক্ গিরিবর্ত্মের" সুখের দুঃখের দিনগুলি স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন অমলিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ছাড়াছাড়ির প্রতি মুহূর্ত্তে মনে পড়তে লাগল রাবণের সেই খেদোক্তি—

"শত দীপাবলী তেজে প্রজ্বলিত নাট্যশালা সম,
আছিলরে এ সুন্দর পুরী মোর। এবে হায়,
একে একে নিভিছে দেউটি, নীরব রবাব বীণা
তবে হায় আর কেন রহিবরে হেথা—
কাররে বাসনা বাস করিতে আঁধারে॥"

পরক্ষণেই মনে হয় কেন এই খেদ, অকারণ এই ক্ষোভ। শুধু বারে বারে আসা-যাওয়া আর ফিরে চাওয়া এইতো পৃথিবীর চিরন্তন নিয়ম তবুও দুঃখের সঙ্গে গান ধরলাম, "এহি হ্যায় জিন্দেগী-কা কাঁরোয়া

আজ ইঁহা আউর কাল উঁহা ;
ফির্ কেঁউ তেরা দিল্ হুয়া অধীর,
ফির্ কেঁউ তেরা প্রাণোমে পীড়্ ;
ফির্ কেঁউ তেরা নয়নমে নীর।"

এবার চলেছি নকিডক্ গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে গিয়ে তিন টন ভারবাহী মোটর লরীতে। এই গিরিবর্ত্ম সাত মাইল লম্বা এবং মাত্র আট হাত চওড়া, দুই হাজার ফুট এর উচ্চতা। ডিনামাইট্ দিয়ে পাহাড়ের দেহ ফাটিয়ে তার বক চিরে সর্পিল ভঙ্গীতে এঁকে-বেঁকে তৈরী

হয়েছে এই রাস্তা, এই পাহাড়টি সম্পূর্ণভাবে মাটির নয়। খানিকটা জায়গা স্তরে স্তরে সজ্জিত পাথরের স্তূপ শ্লেটের পাহাড়ের মতন গাঁথা। শিখর দেশে ঘন জঙ্গল এবং বিটপী শ্রেণী। এখানেও সেই প্রাণান্তকারী খাড়া চড়াই এবং উৎরাই। প্রকৃতির অপরূপ রঙ্গীন বন-সজ্জায় বিভিন্ন রং বেরংয়ের প্রস্ফুটিত বন্য পুষ্পরাজির অপূর্ব্ব রূপ-সম্ভারে সমৃদ্ধ এই পাহাড়টি। সমতল ভূমি থেকে যখন এই বিশাল ভারবাহী গাড়ী উপরে উঠতে সুরু করে—পাহাড়ের চূড়ার দিকে চেয়ে নিরাপদে যে সেখানে পৌঁছতে পারব সে ভরসাই হয় না। খাড়া পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠতে হয়, চড়াইর পথ তারপর উৎরাই আবার সেই চড়াই। তু'পাশে গভীর খাদ, মাঝে মাঝে সাঙ্কেতিক বিপদসূচক বিজ্ঞাপন চালককে সতর্ক করে দিচ্ছে। "মৃত্যু প্রাচীর" (wall of death)। গাড়ীর চাকা মাটির দেওয়ালের সেই সীমানার একটু এদিক-ওদিক হলেই মৃত্যুর অতল গহ্বরে পতন অনিবার্য্য। মাত্র চারটি সুতীক্ষ্ণ মোড় ঘুরে গাড়ীকে তু'হাজার ফিট্ উপরে উঠতে হয়। তারপর সুরু হয় ঢালু উৎরাইর পথ।

গিরিবর্ত্মের শীর্ষদেশে এক লাইন গাড়ী, মধ্যস্থলের মোড়ে আমাদের গাড়ীর লাইন; নিম্নস্থ মোড়ে আর এক লাইন গাড়ী। মনে হয় এই বুঝি এক লাইন গাড়ী টাল সামলাতে না পেরে অন্য লাইনের ঘাড়ে চেপে পড়বে। খাড়া চড়াইর মুখে মাল বোঝাই গাড়ীর উপরে উঠতে অনেক সময় লাগে। সমতা রক্ষা করতে না পেরে পেছিয়ে আসে কিন্তু পরক্ষণেই

শক্তিশালী ইঞ্জিন ভীমবেগে গর্জ্জন করে আবার অগ্রসর হয়। সর্ব্বশেষে প্রকৃতির এই প্রস্তরীকৃত অচল বাধা মানুষের কাছে হার মানে। কিন্তু বিজ্ঞানের সব কিছু উদ্ভাবনী শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির সচল বেগবান শক্তি—আরাকান বর্ষার তাণ্ডব লীলার কাছে মানুষকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এরই মধ্যে যেখানে বরুণদেবের রুদ্রলীলা অনেকটা লঘু এবং সহনীয় সেখানেই আমরা ছুটেছি আশ্রয়ের জন্য।

সাত মাইল দীর্ঘ এই গিরিপথ মোটরে পার হতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। গিরিবর্ত্ম পার হয়ে সমতল জায়গায় পৌঁছে সেকি স্বস্তি, তৃপ্তি! পাহাড়ের প্রাচীরে ঢাকা কারাগার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনের কূলে কূলে জাগল পরম আনন্দের ঢেউ, প্রাণের তুই তীর উপছে উঠল, সে আনন্দে। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, চার পাঁচ মাইল ব্যাপী সমতল ধান্য ভূমি, দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে দিগন্তের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। উপরে মুক্ত নীল আকাশ। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের পর্ণকুটির। সম্মুখের আঙ্গিনায় বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা শাক-সব্জীর ছোট বাগান। খেজুর, নারিকেল, সুপারী এবং কলাগাছের বিস্তীর্ণ পরিসর, মাঝে তু'একটি আমগাছ। কচি আম বাতাসে দোল খাচ্ছে। ছোট ছেলেমেয়েরা মহানন্দে কাঁচা আম পাড়ছে। আম কুড়াবার জন্য সে কি উল্লাসময় হুড়াহুড়ি। গৃহপালিত তু'চারটে পশু ইতস্তত বিচরণ করছে—বহুকাল পরে এই সব দৃশ্য দেখে মনটা খুসীতে ভরে উঠল।

ছেলেবেলায় বাংলা মায়ের পল্লীর শ্যামল প্রাঙ্গণে খেলা-ধূলার কথা মনে পড়ল। বেদনায় মনটা টন্ টন্ করে উঠল। আজ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করলাম যে, জীবন শুধু ফেলেই আসিনি তা থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছি। সেইতো ছিল আমাদের জীবনের সত্যিকার সম্পদ যা থেকে বর্ত্তমান নাগরিক সভ্যতার মোহ আমাদের সমূলে উচ্ছেদ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাণ শক্তিও শেষ হয়েছে। আজ নগরীর বুকে বসে কোন মতেই গাইতে পারি না—

> "আজি শ্যামলে শ্যামল,
> ঐ নীলিমায় নীল
> আমায় নিখিল
> তোমাতে পেয়েছে
> আজি অন্তরের মিল ৷৷"

এই ভাবে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে, মাটির রাস্তার ধূলির ঝরণায় স্নান করে ঠিক চার মাস পর আবার বউলী বাজার ফিরে এলাম। সেই একদিন আর আজ—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। যুদ্ধ কোলাহলের বহুদূরে, এখানে সব কিছুই শান্ত, নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ততা। পর্ণ কুটীরে আশ্রয় পেলাম। ভূগর্ভের খাঁচা ছেড়ে মাচার ঘরে অবস্থান এখন বিলাসিতা বলেই মনে হতে লাগল। সাহেবরা এই সব খড়ের বা বাঁশের বাতার বুননী বেড়া দিয়ে ছাউনী বাঁশের মাচার ঘরকে বাসা (basha) বলে। একটু গাল ভরা পোষাকী নাম না দিলে যেন এদের ভাল লাগে

না। এখানে কোন রকম বিধি নিষেধ নেই, নির্ভয়ে সব সময়ই চলাফেরা যায়। বহুদিন পর ভূগর্ভের অন্ধকার থেকে বাইরে এসে প্রথম রাত্রের হ্যারিকেনের আলো তামসী রাত্রের পর প্রভাত সূর্য্যোদয়ের মতই মনে হল। এই প্রথম নিঃশঙ্কচিত্তে বুট পটি খুলে ধড়া চূড়া ছেড়ে শুতে পেরে কি যে তৃপ্তি হল তা কি করে বোঝাব। ভগবান অদৃষ্টে লিখেছেন ভবঘুরে যাযাবর জীবন, ত্ব'দিন পর শুনলাম—"মুশাফির বাঁধো গাটরীয়া, বহুদূর যানা হৈ।"

আভাস

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ, রিক্ত মন. আর চলেনা। সমস্ত রকম কোলাহলের বাইরে বিশ্রামের প্রয়োজন আজ একান্ত ভাবে বিশেষ করে অনুভব করলাম। অদৃষ্ট দেবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীকান্তের কথায় অভিযোগ জানালাম—"জীবনটা কি চিরকাল উপগ্রহের মতই কাটিবে। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এ জীবনে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এতকাল পরে না পাইলাম তার কাছে আসিবার অনুমতি, না পাইলাম তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার অধিকার।" সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আজ উপলব্ধি করলাম :—

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাইনা।"

জীবনের আর একটি সহজ সত্য উপলব্ধি করলাম। বেশীর ভাগ লোকই যুদ্ধে এসেছে টাকা জমিয়ে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে গড়া ভবিষ্যৎ সুখনীড় রচনা করবার আশা নিয়ে। অনেকের আশা মুকুলেই ঝরে গেল। আর যারা কিছুদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকোলাহলের ভিতর কাজ করেছে তারা ছ'দিনেই অর্থের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করেছে। যে অর্থ একদিন জীবনের চরম এবং পরম কাম্য বলে বরণীয় ছিল সেই অর্থই তখন হয়ে ওঠে নিষ্প্রয়োজনীয় বোঝা। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে এই ভাবেই মোহমুক্তি হয়। অর্থ যথেষ্ট উপায় করেছি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কাজেই তা লাগেনি। সুযোগ সুবিধা হলে অর্থ পৃথিবীর সব জিনিষের অন্তঃসারশূন্য বহিরাবরণ কিনতে পারে কিন্তু কিনতে পারেনা তার অন্তরস্থিত খাঁটী সার পদার্থ। নানা রকম সুচারু সুপেয় খাদ্য জায়গা বিশেষে অর্থের জোরে জোগাড় হতে পারে কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক বা পরিপাক করাতে সে শক্তি অসমর্থ। নানাবিধ ঔষধ পত্র, টনিক, ফুড্ কিনতে পারা যায় বটে কিন্তু অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়না অটুট স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য। বহু লোকের সংগে চেনাশোনা হবে অর্থের জোরে কিন্তু অকৃত্রিম আন্তরিক বন্ধুত্ব ক্রয় করতে সে অসমর্থ। অর্থের শক্তিতে প্রচুর দাসদাসী জোগাড় হতে পারে কিন্তু বিনিময়ে আনতে পারেনা বিশ্বস্ততাপূর্ণ প্রাণঢালা একনিষ্ঠ সেবা। সর্ব্বশেষে অর্থ ক্ষণভঙ্গুর অসার আমোদ প্রমোদ, বিলাস ব্যসনের অফুরন্ত আয়োজনের জোগান দিতে পারে

কিন্তু মানুষের চিরকাম্য সুখ ও শান্তির সন্ধান দিতে সে অপারগ অসহায়। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আমরা জীবনের অনেক সহজ এবং সাধারণ সত্য উপলব্ধি করতে বাধ্য হই, সমর্থ হই।

কিন্তু এমনি অদ্ভুত আমাদের এই ভুলো মন। মৃত্যুর ছায়া সরে যেতে না যেতেই এই সব সত্য মন থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে দিই। নিশ্চিন্ত আরামে চিরাচরিত প্রথায় অভ্যাস-যন্ত্রের চাকাগুলো ঘুরাই; গড্ডালিকা প্রবাহে জীবনতরী আবার ভাসিয়ে দিই। জীবন নিয়ে এই যে খেলা, কোন সে বিধাতার নিষ্ঠুর লীলা? মিথ্যা মোহাচ্ছন্ন আবরণ চিরকালই কি আমাদের অন্তরের সত্যকে ঢাকা দিয়ে চেপে রাখবে? মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসার জয় ঘোষণা এবং অসংশায়িত বাণীতে তার প্রকাশ এই ভারতই একদিন করেছিল। এই ভারতই একদিন মানব অন্তরের সত্যের সন্ধান সর্ব্বপ্রথমে পেয়েছিল। এই মর জগতে এনেছিল দেবত্ব। এই ভারতই জগৎকে সর্ব্বপ্রথমে শুনিয়েছিল তার মহতী বাণী, তাঁরই সন্তান আমরা, আমরা কি কোনদিনই আবার জগৎকে সম্বোধন করে বলতে পারব না, "শৃন্যন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" তমসার ওপারে সেই জ্যোতির্ম্ময় অমৃত আবাসের সন্ধান আমরা কবে আবার পাব? কবে আমরা বুঝব এই পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা যত গভীর, যত নিবিড়ই হোক না কেন মানুষকে তা চিরকালের তৃপ্তি দিতে পারেনা। মানুষের মনের হিসাব, আত্মার হিসাব ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে নয়; তাই হাজার সুখ শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরামে

মধ্যেও আমাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কবে আমরা বলতে পারব—"এইখানেই আমি শেষ নই, কোন খানেই শেষ নাই। আমি চলব আমার চেতন লোকের আলোকে আলোকে, আমার শক্তির ইসারায় ইসারায়, আমার আনন্দ লোকের সুরে সুরে। আমি অমৃতের সন্তান, আমি দেবতা, আমি অমৃত পিয়াসী।"

উনিশ

আরাকান গ্রীষ্ম অভিযানের পালা শেষ হোল, যাত্রা সুরু করলাম বৃহৎ 'নাফ' নদীর শাখা 'প্রোমাচং' নদীর উপর দিয়ে। এ যাত্রায় আর কোন প্রকার যানবাহন বাদ রইল না। ষ্টীম লঞ্চ, গাধা বোট, ল্যাণ্ডিং ক্র্যাফ্‌ট (Landing Craft) হিগিন্‌সন্‌ বার্জ্জ (Higinson Barge)। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে প্রোমাচং নাফ্‌ নদীতে পড়েছে। নাফ্‌ নদী মোড় ঘুরে বেঁকে গিয়ে মংডোর নীচে বঙ্গোপসাগরে শেষ হয়েছে।

নদীর জল লবণাক্ত। দিনে দুবার করে জোয়ার ভাঁটা খেলে। চলার পথে জোয়ারের ভরসায় বসে থাকতে হয় নতুবা ষ্টীমলঞ্চ ভারী মালবাহী গাধা বোট টেনে নিয়ে কূলে ভিড়তে পারে না। এই পথেই বর্ষাকালে খাদ্যদ্রব্য রসদ যুদ্ধের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ চলত। এদেশী নৌকা আমাদের দেশীয় নৌকা হতে ভিন্ন আকারে তৈরী। নাম

"সাম্পান"। মাঝি মাল্লা সবই আরাকানী মুসলমান, আরাকানী মগের সংখ্যা খুবই কম। বৃটিশের বর্ম্মা ত্যাগের পর এবং জাপানীদের পূর্ণ অধিকার স্থাপনের মাঝে ভয়াবহ অস্থায়ী এক অরাজকতা ঘটে। সেই সময় আরাকানী মুসলমান এবং মগে চলে হানাহানি লুটতরাজ খুনোখুনি। এই গৃহ যুদ্ধের ফলে মগরা আরাকানের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আরাকানীদের পরণে লুঙ্গী, মাথায় রং করা বাঁশের হাল্কা টুপী, গায়ে বিশেষ কোন জামা থাকে না। এরা এক একজন একখানি সাম্পান চালায়। সাম্পানের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়িয়ে থেকে ঝটকার মত হেঁচকা টান মেরে দুহাতে দুটো দাঁড় টানে, অনেকটা চীন দেশের নৌবাহকদের মত।

আমাদের জিনিষপত্র বোঝাই করে নতুন জায়গায় গিয়ে উঠতে পাঁচদিন লাগল। আমরা মাত্র মালবাহী একখানি বার্জ্জ পেলাম। জিনিষপত্র একবার লরীতে চাপিয়ে নদী থেকে দুশ গজ দূরে অস্থায়ী এক জেটীর ধারে নামান হল। তারপর জেটী থেকে মোটর বার্জ্জে চাপান হল। প্রথমে রওনা হল অগ্রগামী দল। তারা গন্তব্য স্থানে পৌছে জেটির ধারে জিনিষ পত্র নামিয়ে রেখে বার্জ্জখানি আবার আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠাল। এই রকম ভাবে চক্রাকারে চলল যাতায়াত। ওদিকে নদীর পার থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে নতুন করে হাসপাতাল খোলার বন্দোবস্ত হ'তে লাগল। সব জিনিসপত্র একত্র করে, তাঁবু খাটিয়ে হাসপাতাল চালু করতে সাতদিন লেগে গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হাসপাতাল এবং অস্ত্রোপচার গৃহের জন্য খড়ে ছাওয়া বাঁশের সব বাসা তৈরী হল। আমরা রয়ে গেলাম তাঁবুর নীচে।

জায়গাটির নাম রেডওয়েম বিন্। বউলী থেকে মংডো পর্য্যন্ত প্রসারিত জল পথে প্রোমাচং এবং নাফ্ নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। একদিকে প্রোমাচং নদী অর্দ্ধবৃত্তাকারে নাফ্ নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। নাফ্ নদী উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। উত্তরে তাম্ব্রু ঘাট, দক্ষিণে নীলা টেকনাফ উপদ্বীপ ঘুরে মংডোর নীচে সমুদ্রে মিলেছে। পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে দিগন্তব্যাপী সেই চির পরিচিত আরাকান পর্ব্বতমালা। নাফ্ নদী বর্ম্মা এবং ভারতবর্ষের সীমান্ত নির্দ্দেশ করছে। নদীর পশ্চিম তীরে ভারতবর্ষের বাংলা প্রদেশ। আর পূর্ব্ব তীরে বর্ম্মার আরাকান প্রদেশ। আরাকান আসামের মতই আমাদের প্রতিবেশী অথচ আরাকান সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ।

নদীর জল ঘোর লবণাক্ত। পানীয় জলরূপে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পানীয় জল আসত অনেক দূরে এক পাহাড়ী ঝরণা থেকে জল বাহী মোটরে (Water Truck)। প্রত্যেকের জলের বরাদ্দ ছিল সর্ব্বসাকুল্যে দুই সের, দিনে এক সের করে দুবার বণ্টন করে দেওয়া হ'ত। এই দিয়ে সব প্রয়োজন শেষ করতে হবে। দুঃসহ গরমে গলা, বুক শুকিয়ে

যাচ্ছে; সূর্য্যের তাপে শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, আকণ্ঠ জল পান করে পিপাসা মেটাবার উপায় নেই।

নদীর বুক ছেয়ে রয়েছে অসংখ্য জেলী মাছ (Jelly Fish)। এরা সব ধূসর শ্বেত বর্ণ এবং দূর থেকে ঠিক মেলে ধরা ছাতির মতন দেখায়। এদের শরীরে মধ্যস্থিত কাণ্ডের নিম্নাংশে পাঁচটি প্রস্ফুটিত পাপড়ির মত থলে, সোজাভাবে জলের নীচে ঝুলতে থাকে। এদের সাহায্যে এরা দেহের সমতা রক্ষা করে। অবাধে জলের বুকে ঘুরে বেড়ায়। উপরের মেলে ধরা ছাতির অংশ প্রসারণ এবং সঙ্কোচন করে এরা শিকার ধরে। সঙ্কোচন করে শিকার ধ'রে এরা জলের নীচে ডুবে যায় এবং নদীর তীরে এসে লাগে। আবার প্রসারণ করে উপরে ভেসে উঠে নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। জেলী মাছ বিশেষ কেউ খায় না। কারণ এদের দেহ থেকে এক রকম বিষাক্ত রস নির্গত হয়, যা পেটে গিয়ে দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নদীর তীরে শ'তিনেক গজ দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে আমাদের এই ক্যাম্প। অদূরে একটি ছোট পল্লী, দুই ধারে দুই শাখানদী, দুই তীরে কলা বাগানের বিস্তীর্ণ পরিসর। ওপারে বাবলার বন ও নারিকেল শ্রেণী। বাবুই পাখীর দল তাতে বাসা বেঁধেছে। ভেতরে ভেতরে আম্র বীথির সার চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কাঁঠাল গাছে ফল ধরে রয়েছে। পাহাড়ের কোলে নদীর তীর ঘেঁসে সারি সারি পর্ণকুটির, বাংলার কমনীয় মমতাময়ী পল্লীশ্রীর অবিকল প্রতিকৃতি।

কুর কুর কুর কু কোন ঝোপের আড়ালে বসে ডাহুক একটানা ডেকে যায়। বাবলার ঝোপের নীচে ছাতারে পাখীর দল কিচির মিচির জুড়ে দেয়, দুর্গা টুনটুনির দল ফর্ ফর্ করে মহানন্দে উড়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে দোয়েল পাখীর শীষ কানে ভেসে আসে। রঙ্গীন মাছরাঙ্গা পাখী শিকার লক্ষ্য করে ঝুপ করে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য বলাকা এবং জঙ্গলা পাখী দল বেঁধে আকাশ বেয়ে ভেসে বেড়ায়, সুদৃশ্য রং বেরংয়ের কত যে বনের পাখী এবং ফুল চোখে পড়ে, তাদের নাম এবং চেহারা আমার অচেনা, অজানা। জঙ্গলা পাখী জঙ্গলা ফুল বলে তাদের পরিচয় শেষ করতে হয়। জলের কোল ঘেঁসে অসংখ্য ছোট বড় লাল কাঁকড়া রোদ পোহায়। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় কে যেন একটি লাল ভেলভেটের আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে।

সন্ধ্যার পর সেই নীরব নিস্তব্ধ জলে মেঘের ছায়া পড়ে। জ্যোছনা রাতে চাঁদের আলোয় ঝলমল রহস্যময় এক সৌন্দর্য্য পুরী গড়ে তোলে। পায়ের নীচে প্রবাহিত নদী, উপরে অনন্ত সুনীল আকাশ, দূরে পাহাড়ের কোলে গ্রাম্য কুটির এবং বন বীথি, কোন রকম ব্যাখ্যার দ্বারা তাকে বোঝান অসম্ভব।

মুগ্ধ হয়ে অবাক বিস্ময়ে দিগন্তের পানে চেয়ে নদীর তীরে বসে থাকি। জলে, স্থলে আকাশে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বিচিত্র রূপ সম্মিলনের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি "অখণ্ড সুষমার বাণী"

"এক অপরূপ সঙ্গীতের সুর", অন্তরের উপলব্ধি প্রকাশ পেল মহাকবির কবিতার ছত্রে—

"দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।"

বহুদূরে পেছনে ফেলে আসা বাংলার শ্যামল পল্লী জননীর গৃহ কোণের পথের দিকে চেয়ে মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কোলে বসে যুদ্ধ কোলাহল ছাপিয়ে উঠল পেছনে ফেলে আসা পল্লী মায়ের আহ্বান, "ফেলে আয় ছিঁড়ে আয় সমস্ত বন্ধন।" ভবঘুরে এই জীবনে ঘৃণা, ধিক্কার জন্মে গেল।

প্রকৃতির কোলে অন্তরঙ্গ ভাবে বাস করছি। তারই বুকে বিচরণ করছি। অথচ প্রাণভরে সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম, সে মাধুর্য্য উপভোগ করবার মত মনের অবস্থা, ক্ষমতা নেই। যুদ্ধের কঠিন কঠোর বাস্তবতা, নগ্নহিংস্রতা, সব কি[illegible] দলে পিষে চুরমার করে দিয়ে যায়। প্রচণ্ড সূর্য্যের [illegible] কচি কিশলয় যেমন জ্বলে পুড়ে শুকিয়ে ঝিমিয়ে যায়, যুদ্ধের দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকের আবর্ত্তে তেমনি মনের সব কিছু কোমল প্রবৃত্তি, সৌন্দর্য্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গী অকালে নেতিয়ে পড়ে। প্রাণ প্রাচুর্য্যের মনিদীপ নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ভগ্ন মৃৎ প্রদীপের অনুজ্জ্বল শিখার মত, মনের মানুষটি মরে গিয়ে সব মানুষ প্রেতে রূপান্তরিত হয়।

১

কুঁড়ি

এখানে এসে অবধি হাসপাতালের কাজ কর্ম্ম খুবই কম। দুরন্ত বর্ষার প্রবল প্রকোপে যুদ্ধের গতি মন্থর, অবস্থা প্রায় অচল। শুধু দুই পক্ষের পর্য্যবেক্ষণ এবং পরিভ্রমণকারী সৈন্যদের কড়া পাহারা চলে। কদাচিৎ উভয়ের সাক্ষাৎকারের ফলে ছোটখাট সংঘর্ষ হয়। অপর্য্যাপ্ত অবসর থাকায় সুরু হয় পূরো মাত্রায় নানারকম ক্রীড়া কৌতুক, হাসি, খেলা, গান আমোদ প্রমোদের প্রবল প্রকাশ। ছোট ছোট হাসপাতালে যেখানে বিলিতী শুশ্রূষাকারিণী মেম সাহেবরা আছেন, সেখানে চলে নৃত্য, গান, ভোজন, যুগ্ম সন্তরণ, জলক্রীড়া এবং রকমারি বন ভোজনের পর্ব্ব। জীবনকে উপভোগ করতে এরা শুধু বোঝে শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর বাহিরের হৈ চৈ। নিষ্ঠুর হত্যালীলার মাঝখানে এই আমোদ প্রমোদের নির্লজ্জ প্রয়াস মানুষের চরম স্বার্থপরতার পরিচায়ক। আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা, যার ফলে আমরা অন্তরের ধর্ম্মকে খর্ব্ব করে বাহিরের কর্ম্মকে প্রবল করে তুলেছি, আমাদের উপর বিধাতার এ এক নিষ্ঠুর অভিশাপ।

নানারকম ভোগ বিলাসের আয়োজন, দেহকে সাজিয়ে উপভোগ করবার নানাবিধ প্রচেষ্টা মনকে পলে পলে

পঙ্গু করে তুলছে। মনকে অস্বীকার করে নেশায় মেতে নিত্য নতুন আমোদ প্রমোদ, বিলাস ব্যসনের প্রকরণ উদ্ভাবনে আমরা ব্যস্ত রয়েছি। আমরা ভুলে যাই মনুষ্য জীবন অকৃত্রিম, অনন্ত; সভ্যতা তার তুলনায় নেহাৎ ক্ষণ-ভঙ্গুর। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকে কত রকম সভ্যতা কত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল, আবার পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। তবুও আমরা আর এক সভ্যতার কৃত্রিম খোলসটুকুর বনিয়াদ গড়ে তুলতে ব্যস্ত।

আমাদের জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল কি হয়েছে? সহজ, সরল স্বাভাবিক জীবন যাপন আমাদের ধারণার, আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, নব নব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে মানুষ তার কীর্ত্তির জয়স্তম্ভ স্থাপন করবার চেষ্টা করছে। মানুষের চিরকাম্য সুখ, মানসিক শান্তি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নাগালের ঊর্দ্ধে চলে যাচ্ছে। বেড়ে চলেছে অতৃপ্তি, আকাঙ্খা, কামনা, মানসিক অস্থিরতা, অস্বোয়াস্তি এবং দৈন্য। প্রীতি এবং মৈত্রীর দৌর্ব্বল্য ঘটেছে, পরস্পর পরস্পরকে করি সন্দেহ, সততায় করি অবিশ্বাস; আন্তরিকতা গিয়েছে মুছে, দেশব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে এক ধ্বংসানল, যার শিখায় সমস্ত মানবত্ব আজ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। অথচ নিজেরাই সঠিকভাবে বলতে পারি না আমরা কি পেলে সুখী হব? কিসে হৃত শান্তি, স্বস্তি ফিরে পাব? আনন্দ উৎসবের আমোদ প্রমোদের এত আয়োজন থাকতেও একটা

অজানা অভাব মনে প্রাণে অনুভব করি কেন? অতৃপ্তি কেন দিন দিন বেড়ে চলেছে? এক ঘেয়েমি ক্লান্তির পাষাণ ভার দিনের পর দিন জগদ্দল পাথরের মত আমাদের চেপে পিষে মারছে। চলার পথে কেবলই জট পাকিয়ে চলেছি, সত্য ও সুন্দরের রূপ ভুলে গিয়েছি। এই ধ্বংস স্তূপের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সব কিছু কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, সব কিছু হীণতা দীনতা এবং হিংসা দ্বেষের সমাধি হয়। মানুষ আবার যেন এই ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য স্থূল সংসারিক বুদ্ধির উপর দিয়ে তার অন্তরের চিরজয়ী রথচক্র সবলে পরিচালনা করতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত পাপ ও গ্লানি তার বুক থেকে ধুয়ে মুছে যাক সত্যের জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশে।

* * * *

আজ জানতে পারলাম শীঘ্রই ছুটিতে দেশে ফিরব, জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরে যাব। সে এক অপূর্ব্ব আনন্দদায়ক অনুভূতি। একটি একটি করে দিন গুণছি, দিন আর কাটে না। যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ঘরের উপর অন্তরস্থিত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাণের টান অনুভব করতে লাগলাম। জননীর স্নেহ ক্রোড়, ভাই বোনদের ভালবাসা, বন্ধু বান্ধবের সাদর আলিঙ্গন, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর প্রীতি এবং শুভেচ্ছা, গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ; ভাষায় তা কি করে প্রকাশ করব!"

এই পোড়া চোখ দুটো দিয়ে বহুদেশ তো দেখলাম, কত দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোল কিন্তু

আরাকান ফ্রণ্টে

জন্মভূমির মত নাড়ীর টানে কেউতো টানলনা; আজ নতজানু হয়ে যুক্তকরে মনে প্রাণে জননীকে ডাকলাম—

"জননী লহগো মোরে"
সঘন বন্ধন তব, বাহুযুগ ধরে ;
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের ;
উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে,
আমারে লইয়া যাও রাখিও না দূরে"

বন্দে মাতরম্